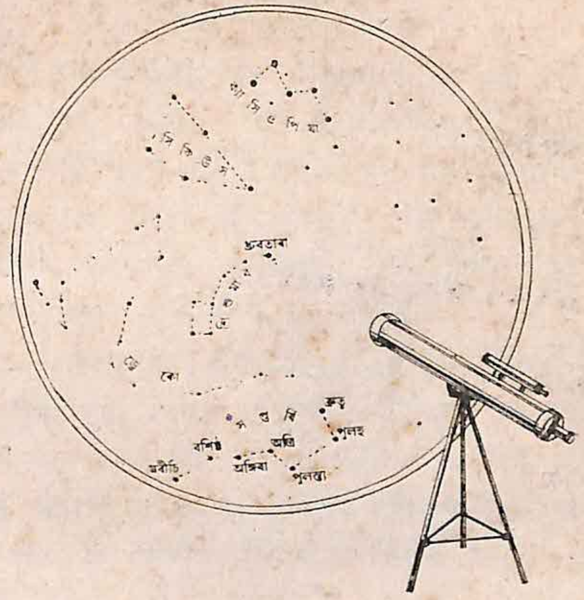
নক্ষত্র পরিচয়



বিমান বসু

নক্ষত্র পরিচয়



বিমান বসু

বয়স্ক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার মান অনুসারে রচিত

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ সুশান্ত বিশ্বাস

দাম ঃ দশ টাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৮৭

মুদ্রণ ঃ
অশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

রঙ্গীন চিত্র মুদ্রণ ঃ
আই. এম. এইচ. প্রেস
চাঁদনী চক, দিল্লী

প্রকাশকের নিবেদন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়নের ফলে পাঠ্যবস্তুর বিষয় শুধু নয় দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গভীর ভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে—তাই ভারতীয় প্রতিটি ভাষাতেই প্রচুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রয়োজন। শুধু বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নয়, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। অথচ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণ বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পান না,—ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা কিছু জানতে পারেন না। অথচ আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হল। ছড়া ও গল্প পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিজ্ঞান চর্চাও আজকের দিনে সকলের পক্ষেই জরুরি।

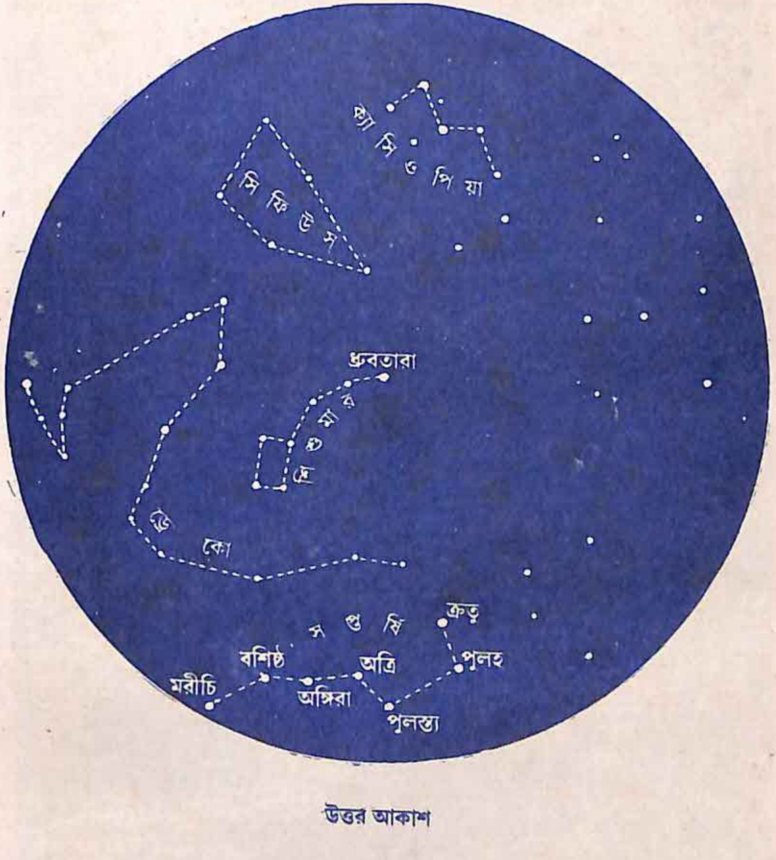
বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা দুরূহ কাজ। তাই ভাষা ও শব্দ চয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যাদের উদ্দেশে রচিত তাদের কিছু মাত্র কাজে লাগলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত—

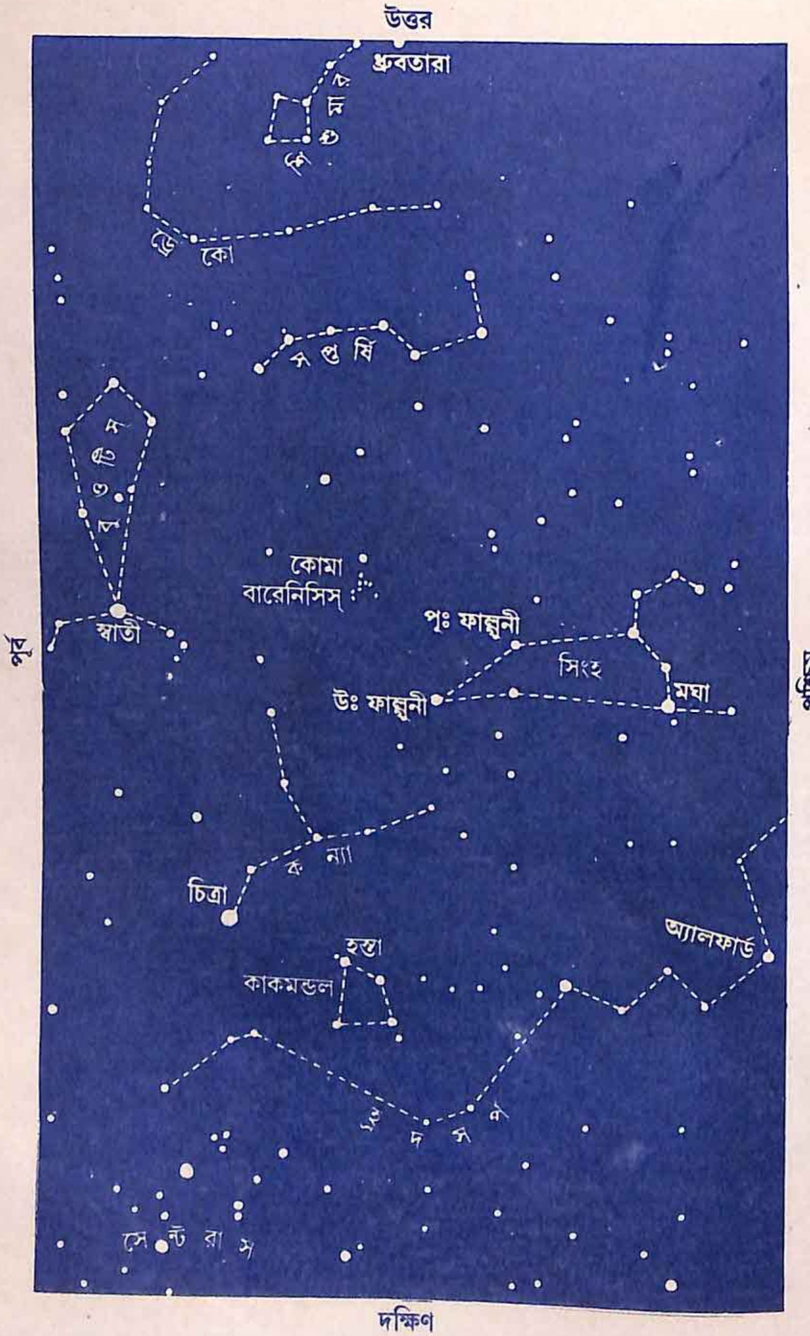
প্রকাশক



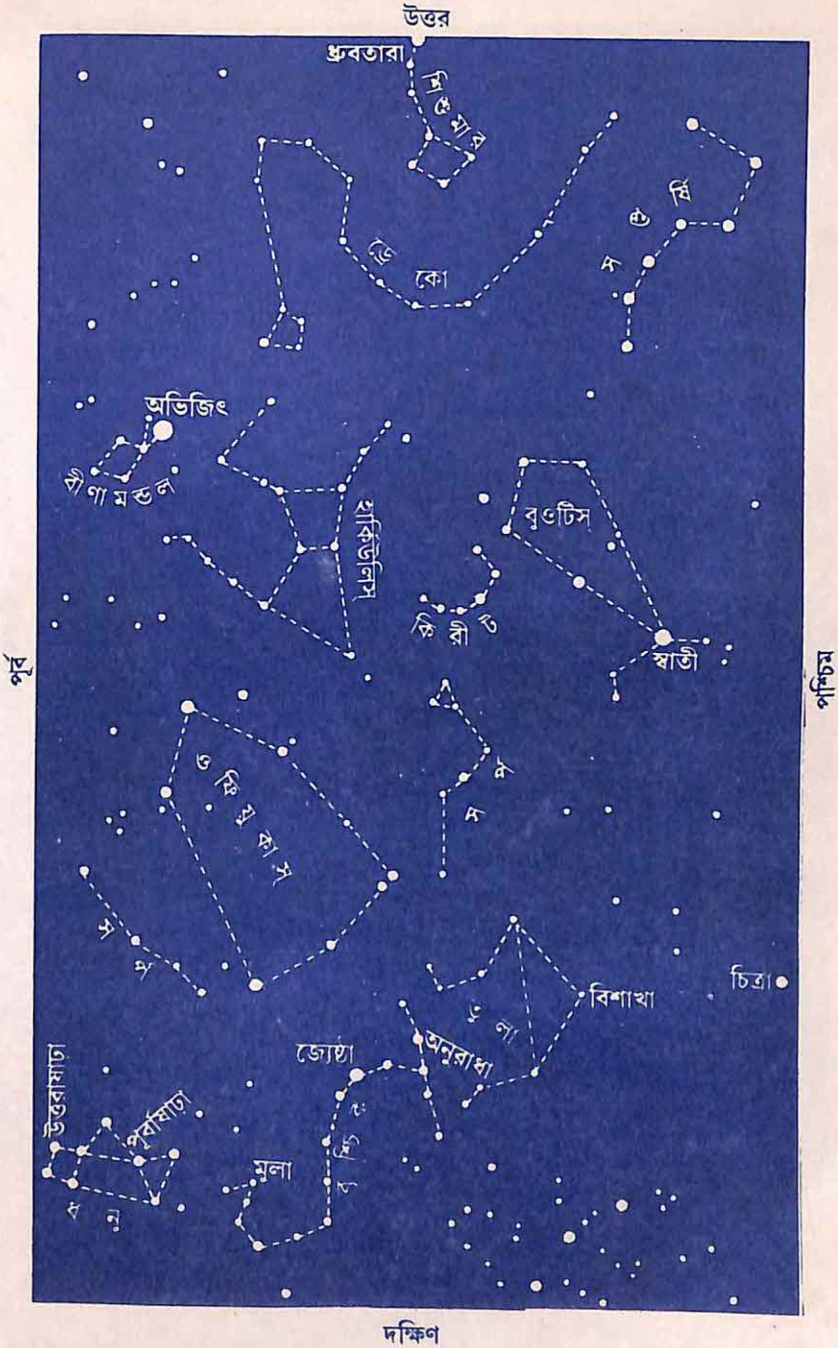
সূচীপত্র



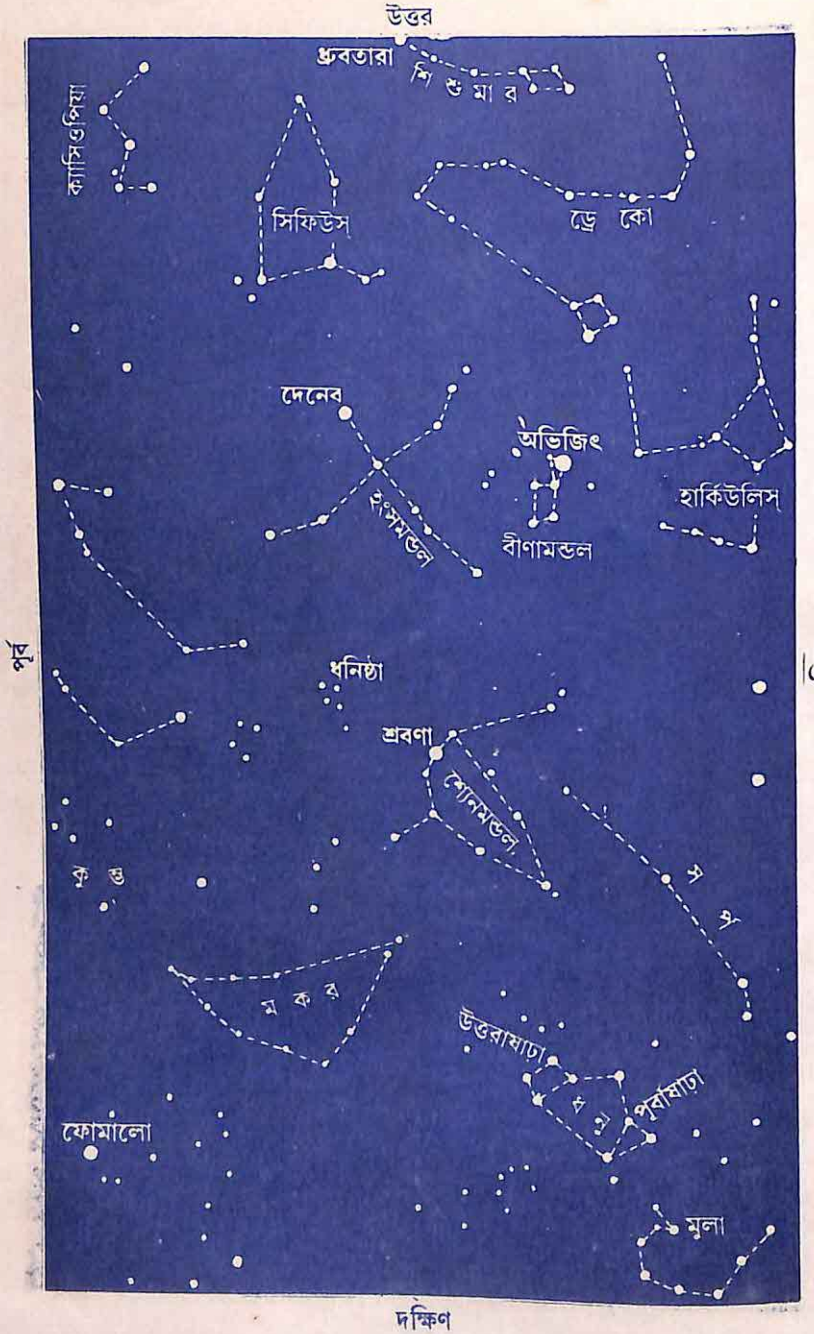
উত্তর আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
ড্রে কো
সপ্তর্ষি
কোমা
বারেনিসিস্
পূর্ব
স্বাতী
পূঃ ফাল্গুনী
সিংহ
মঘা
পশ্চিম
উঃ ফাল্গুনী
কন্যা
চিত্রা
হস্তা
কাকমণ্ডল
অ্যালফার্ড
সেন্টরাস
দক্ষিণ

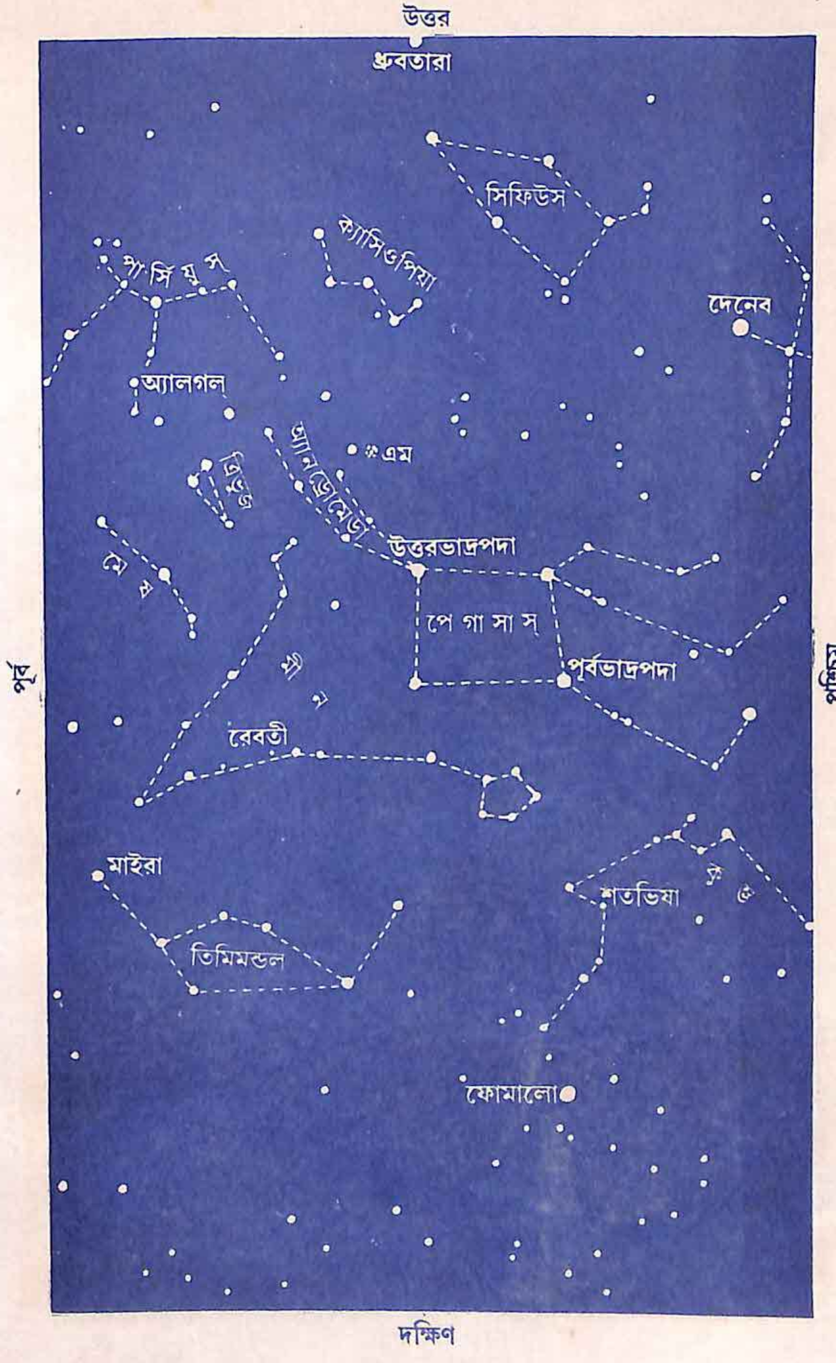
গ্রীষ্মের আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
অভিজিৎ
বীণা মণ্ডল
বুওটিস
স্বাতী
পূর্ব
পশ্চিম
বিশাখা
চিত্রা
জ্যেষ্ঠা
অনুরাধা
মূলা
উত্তরাষাঢ়া
পূর্বাষাঢ়া
দক্ষিণ

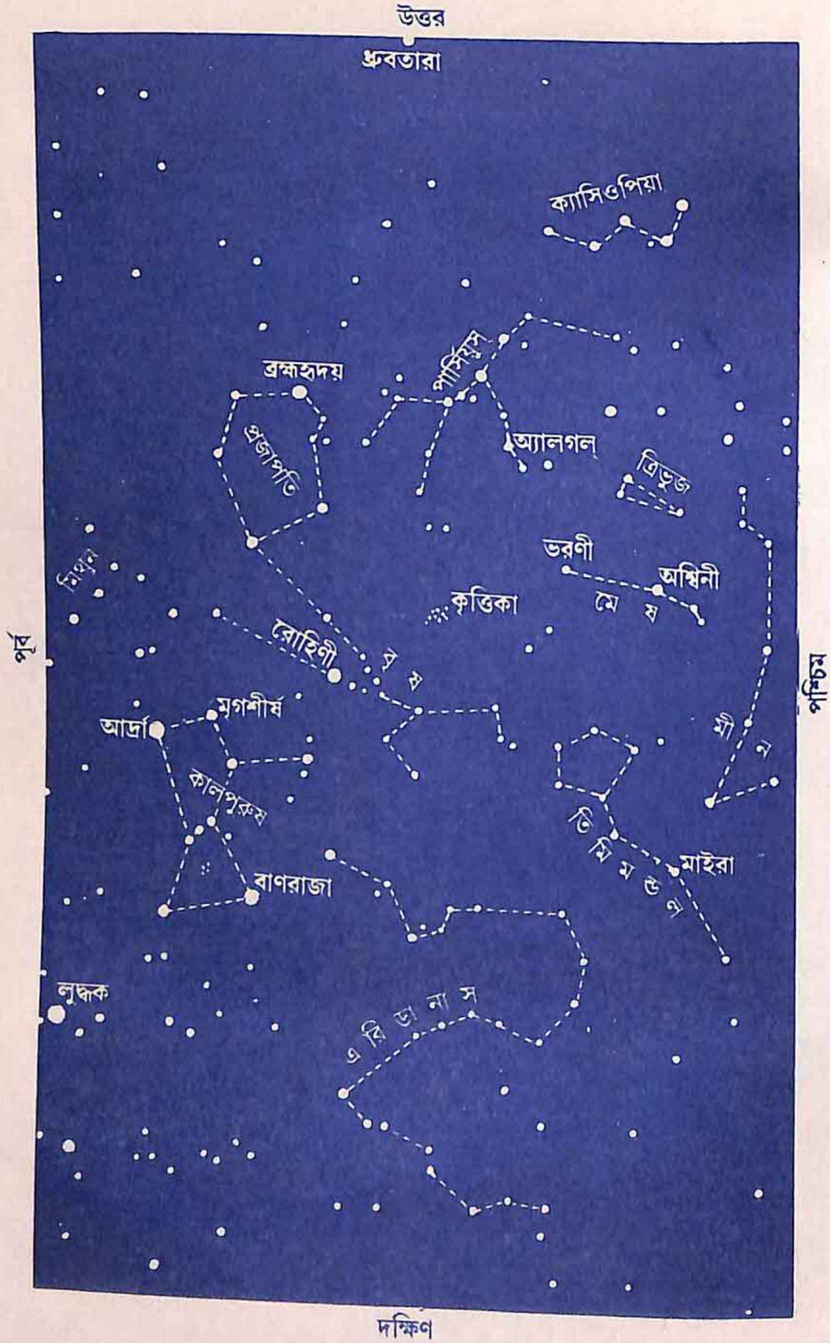
বর্ষার আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
শিশুমার
ক্যাসিওপিয়া
সিফিউস
ড্রেকো
দেনেব
অভিজিৎ
হংসমণ্ডল
বীণামণ্ডল
হার্কিউলিস
পূর্ব
পশ্চিম
ধনিষ্ঠা
শ্রবণা
শ্যেনমণ্ডল
কুম্ভ
মকর
উত্তরাষাঢ়া
পূর্বাষাঢ়া
ফোমালো
মূলা
দক্ষিণ

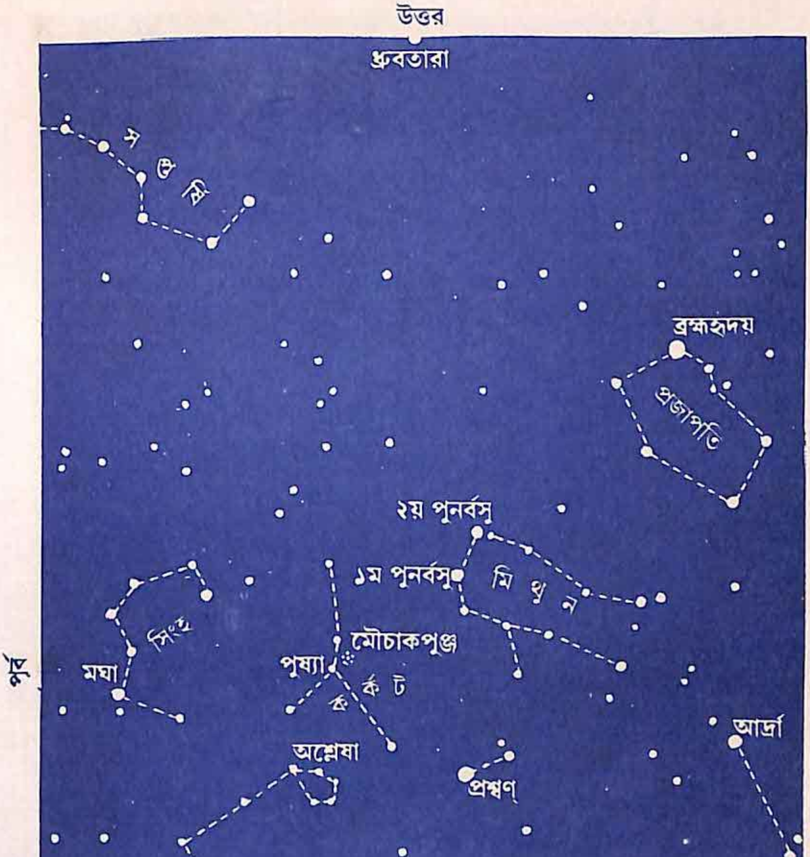
শরতের আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
সিফিউস
ক্যাসিওপিয়া
পার্সিয়ুস
দেনেব
অ্যালগল
এম
অ্যানড্রোমেডা
উত্তরভাদ্রপদা
মেষ
পেগাসাস
পূর্ব
পশ্চিম
মীন
পূর্বভাদ্রপদা
রেবতী
মাইরা
শতভিষা
কুম্ভ
তিমিমন্ডল
ফোমালো
দক্ষিণ

হেমন্তের আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
ক্যাসিওপিয়া
পার্সিয়ুস
ব্রহ্মহৃদয়
প্রজাপতি
অ্যালগল
ত্রিভুজ
ভরণী
অশ্বিনী
মে ষ
কৃত্তিকা
মিথুন
পূর্ব
রোহিণী
বৃ ষ
পশ্চিম
মৃগশীর্ষ
আর্দ্রা
কালপুরুষ
মী ন
তি মি ম ণ্ড ল
মাইরা
বাণরাজা
লুব্ধক
ও রি ডা না স
দক্ষিণ

শীতের আকাশ


উত্তর
ধ্রুবতারা
সপ্তর্ষি
ব্রহ্মহৃদয়
প্রজাপতি
২য় পুনর্বসু
১ম পুনর্বসু
মিথুন
সিংহ
মৌচাকপুঞ্জ
পূর্ব
মঘা
পুষ্যা
কর্কট
পশ্চিম
আর্দ্রা
অশ্লেষা
প্রশ্বণ
অ্যালফার্ড
লুব্ধক
বৃহৎ কুকুর
ভেলা
অগস্ত্য
দক্ষিণ

বসন্তের আকাশ

উত্তর

পূর্ব



পশ্চিম

দক্ষিণ

ছায়াপথ

রাতের আকাশে তারা

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে আর চাঁদ না থাকে তা হলে রাতের আকাশ কেমন দেখতে হয় তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। কালো কুচকুচে আকাশে চোখে পড়ে অসংখ্য হীরের মতো চকচকে তারার ঝাঁক। তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামাঞ্চলে বা পাহাড়ী এলাকায় থাকো তারা নিশ্চয়ই এই দৃশ্য নিয়মিত দেখতে পাও। তবে শহরের আলো এবং ধোঁয়া ধূলোর মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ তারাই দেখতে পাওয়া যায় না। চোখে পড়ে কেবলমাত্র উজ্জ্বল তারাগুলো। তবুও শহরের আকাশে অন্ধকার রাত্রে কয়েক শ তারা শুধু চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব। গ্রামাঞ্চলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায় কয়েক হাজার।

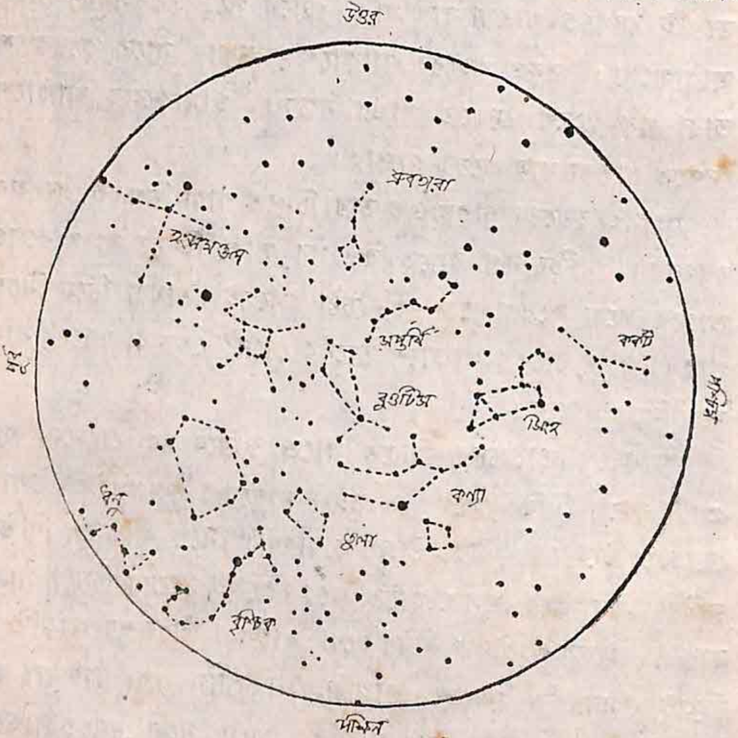
তোমরা হয়তো ভাবছ এত তারা চিনতে পারা নিশ্চয়ই অসম্ভব ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, সব তারা চিনতে না পারলেও তাদের মধ্যে কয়েক শকে একটু চেষ্টা করলেই তোমরা চিনে নিতে পার। তখন রাতের আকাশে তাদের দেখেই তোমরা তাদের নাম বলে দিতে পারবে।

আকাশে তারাদের চিনতে যাতে সুবিধে হয়, সেজন্যে বহু প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৌতুহলী মানুষেরা এক অভিনব উপায় বের করেছিলেন। তাঁরা উজ্জ্বল তারাগুলি নিয়ে আকাশে বিভিন্ন ছবির কল্পনা করেছিলেন, যাতে করে সহজেই তাদের চিনতে পারা যায়। ঐ সব কাল্পনিক ছবির মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তুর আকৃতি ত ছিলই, এমন কি সমুদ্রের জাহাজ, দাঁড়িপাল্লা এবং বাজনার যন্ত্র ইত্যাদি বহু চেনাজানা বস্তুর আকৃতিও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া

যায়। গোটা কয়েক উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী ঐ সব কাল্পনিক আকৃতিকেই আমরা 'রাশি' বা তারামণ্ডল বলে জানি।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে, আকাশে যত তারা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মোট ৪৪টা তারামণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে 12টা আছে রাশিচক্রে যার বিষয় পরে তোমাদের বলব। বিভিন্ন তারামণ্ডলে ভাগ করে দেওয়ার ফলে, বুঝতেই পারছ, আকাশে তারা চেনার কত সুবিধে হয়ে গেছে। কয়েক হাজার আলাদা আলাদা তারার চেয়ে ৪৪টা তারামণ্ডল চিনে নেওয়া নিশ্চয়ই অনেক সোজা।

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। তোমরা খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রপত্রিকায় রাতের আকাশের মানচিত্র বা স্টারচার্ট নিশ্চয়ই দেখেছ। গোলাকার ঐ মানচিত্রে, বিভিন্ন তারামণ্ডলের অবস্থান দেখানো থাকে যা থেকে আকাশে তাদের



ছবি—1

চিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ ধরনের মানচিত্র ব্যবহারের অনেক অসুবিধা আছে।

প্রথমত, ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে মানচিত্রটাকে মাথার ওপরে তুলে ধরে দেখতে হয়, যেটা খুবই অসুবিধাজনক। তা ছাড়া, প্রায় অর্ধগোলাকার আকাশটাকে একটা সমতলে দেখানোর দরুন বিভিন্ন তারামণ্ডলের আকৃতি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্বে অনেক বিকৃতি দেখা দেয়, যার ফলে অনেক সময় বিশেষ কোনও তারামণ্ডলকে খুঁজে বের করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

আর একটা সমস্যা এই যে, ঐ সব মানচিত্র কেবলমাত্র কোনও একটি বিশেষ স্থানে এবং কোনও এক বিশেষ সময় ব্যবহারের জন্যেই তৈরী হয়। যেমন ধরো 14 পৃষ্ঠার ছবিতে রাতের আকাশের বিভিন্ন তারামণ্ডলের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে সেটা দেখা যাবে কেবলমাত্র দিল্লী থেকে 1 জুন রাত 9টায় অথবা 16 জুন রাত ৪টায় কিংবা 1 জুলাই সন্ধ্যে 7টায়। যদি তোমাদের কেউ আরও উত্তরে, ধরো কাশ্মীরে যাও, তা হলে দেখবে যে ঐ মানচিত্রে দক্ষিণ দিগন্তের কাছে যে সব তারা দেখানো হয়েছে সেগুলিকে আর দেখা যাবে না। আবার সুদূর দক্ষিণে, কেরল বা মাদ্রাজে গেলেও ঐ একই ব্যপার। এবারে উত্তর দিগন্তের কাছের তারাগুলিকে দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানচিত্র দেখে তারা চিনতে হলে প্রতিটি জায়গার জন্যে চাই আলাদা আলাদা মানচিত্র।

অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার খুব সোজা উপায় আছে। তা হলো প্রথমে কয়েকটা বিশেষ তারামণ্ডল ভালভাবে চিনে নেওয়া এবং পরে সেগুলিকে কেন্দ্র করে বাকি তারামণ্ডলগুলিকে খুঁজে বের করা।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরো তোমাদের কেউ কলকাতা শহরে নতুন এসেছ। হাওড়া স্টেশন থেকে রাসেল স্ট্রিটে যাবে, কিন্তু রাস্তা চেন না। কি করবে? যদি কলকাতা শহরের একটা মানচিত্র যোগাড় করতে পারো তা হলে তা থেকে

নিশ্চয়ই তোমার গন্তব্যস্থল খুঁজে নিতে পারবে। কিন্তু যদি মানচিত্র না থাকে? তা হলেও উপায় আছে। যদি তোমাকে কেউ রাস্তা বলে দেয়। যেমন ধরো, যদি তোমাকে বলি, হাওড়া ব্রীজ থেকে ব্রেবোর্ণ রোড ফ্লাইওভার দিয়ে নেমে বি. বা. দি. বাগকে ডাইনে রেখে সোজা রাজভবনের পাশ দিয়ে বাঁদিকে শহীদ মিনারকে রেখে মেয়ো রোড বরাবর গিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে ঢুকে ডানদিকের প্রথম রাস্তাটাই হলো রাসেল ষ্ট্রীট, তা হলে নিশ্চয়ই তোমার সেখানে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ বি. বা.. দি. বাগ, রাজভবন, শহীদ মিনার এগুলো সবকটিই হলো কলকাতার বিশিষ্ট. জায়গা, এদের চিনে নিতে মোটেই কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আকাশে তারা চেনাটাও ঠিক একইভাবে করা যায়। যদি বিশেষ কয়েকটি তারামণ্ডলকে একবার ভাল করে চিনে নিতে পারো, পরে তাদেরকেই কেন্দ্র করে ডাইনে বাঁয়ে বা ওপরে নিচে দেখলেই বাকি তারামণ্ডলগুলিকে চিনে নিতে পারবে।

তারা চেনার সহজ উপায় জানবার আগে তারাদের বিষয় কিছু জেনে নেওয়া দরকার। প্রথমেই দেখা যাক্ তারা বা নক্ষত্র আসলে কি।

আকাশে চকচকে বিন্দুর মতো দেখালেও আসলে কিন্তু প্রত্যেকটি তারাই বিশাল আকারের জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। এদের মধ্যে অনেকেরই আয়তন আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক শ বা হাজার গুণ বেশি। কিন্তু বড় হলে কি হবে, এরা আমাদের পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে আছে, আর সেজন্যেই ওরা এত ছোট দেখায়। আমাদের সূর্য মাঝারি আকারের একটা তারা, কিন্তু পৃথিবীর খুব কাছে থাকার দরুন অত বড় দেখায়।

পৃথিবী থেকে তারাদের দূরত্বের একটা আন্দাজ তোমাদের দিই। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে প্রায় 9 মিনিট। সে

তুলনায় আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, নাম 'প্রক্সিমা সেণ্টরি'। তার দূরত্ব প্রায় 42 লক্ষ কোটি (42 এর পরে বারটা শূন্য) কিলোমিটার। অর্থাৎ সূর্যের দূরত্বের প্রায় 60,000 গুণ। প্রক্সিমা সেণ্টরি থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে 4.2 বছর। সেজন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ দূরত্বকে 4.2 আলোকবর্ষও বলা হয়। এটা তো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব। বেশির ভাগ তারার দূরত্ব এর চেয়েও অনেক, অনেক বেশি। সে সব তারা থেকে আলো আসতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে।

অনেক দূরে থাকার দরুন তারাদের নিজস্ব গতি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তাদের আকাশে স্থির মনে হয়। ব্যাপারটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রেল লাইনের কাছের গাছপালা খুব দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। দূরের গাছপালা অত দ্রুতবেগে চলে না, মনে হয় অনেক আস্তে চলছে। আরও দূরে আকাশের মেঘ দেখে মনে হয় প্রায় স্থির হয়ে আছে। আকাশে সূর্য বা চাঁদের বেলাতেও তাই। মানে দূরত্ব যত বেশি, প্রতীয়মান গতিবেগও তত কম মনে হয়। তারাদের বেলায়, হাজার হাজার বছর পরেও তাদের গতি চোখে পড়ে না। মনে হয় তারা যেন সত্যিই আকাশে স্থির হয়ে আছে। আর স্থির বলেই তাদের নিয়ে তারামণ্ডলগুলির কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে।

রাতের আকাশে তারাদের মধ্যে একটা জিনিষ নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। তাদের মধ্যে কোনওটা খুব উজ্জ্বল, আবার কোনও কোনওটা এত ক্ষীণ যে প্রায় দেখাই যায় না। এটা হয় দুটো কারণে। আগেই বলেছি সব তারা এক সাইজের নয়। তাদের মধ্যে কোনওটা ছোট, কোনওটা অতিকায় আকারের। ছোট তারার চেয়ে বড় তারা বেশি জলজলে হবে সেটা স্বাভাবিক। অবশ্য তারার উজ্জ্বলতা তার তাপমানের ওপর নির্ভর করে। যত বেশি তাপমান তত বেশি সে তারার ঔজ্জ্বল্য।

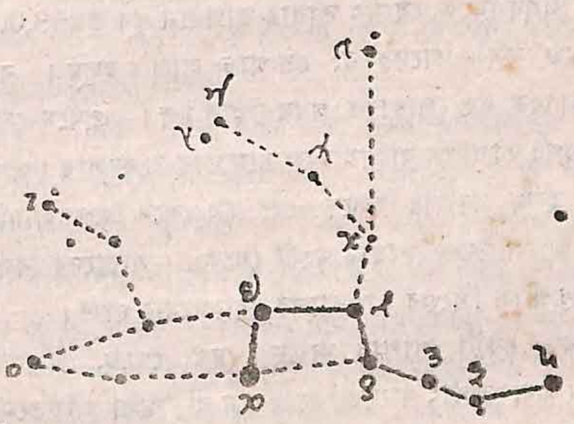
কিন্তু আসলে কোনও তারার ঔজ্জ্বল্য যাই হোক না কেন, পৃথিবী থেকে আমরা তাকে কিরকম দেখবো সেটা নির্ভর করবে দূরত্বের ওপর। আসলে খুব উজ্জ্বল হলেও কোন তারার দূরত্ব যদি বেশি হয় তবে তাকে ক্ষীণ দেখাবে। আবার আসলে ঔজ্জ্বল্য কম হলেও, যদি তারার দূরত্ব কম হয় তবে তাকে অনেক উজ্জ্বল দেখাবে।

পৃথিবী থেকে কোন তারা কতখানি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার একটা মাপকাঠিও আছে। তাকে বলা হয় তারার প্রভার মান (magnitude)। প্রাচীনকালে জ্যোতিষীরা তারাদের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। সেসময় দুরবীন ইত্যাদি ছিল না। সুতরাং শুধু চোখে দেখেই তারার ঔজ্জ্বল্য বিচার করতে হত। এইভাবে, সূর্য অস্ত যাবার পরে প্রথমে যে-সব তারা আকাশে ফুটে ওঠে তাদের বলা হত প্রথম প্রভার তারা। পরেরগুলো দ্বিতীয় প্রভার, তার পরেরগুলো তৃতীয় প্রভার। এইভাবে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভার তারাও চিহ্নিত করা হত। এখানে একটা কথা মনে রেখ, খালি চোখে কেবলমাত্র ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্তই তারা দেখতে পাওয়া সম্ভব।

পরবর্তীকালে দূরবীনের আবিষ্কারের পর দেখা গেল, তারার প্রভা বা ঔজ্জ্বল্যের এই ক্রমিক শ্রেণীবিভাগে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। যেমন ধরো, প্রথম প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্য ষষ্ঠ প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে 100 গুণ বেশি। এর মানে হলো এই যে, কোনও একটি প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্য তার পরবর্তী প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে 2.51 গুণ বেশি। যেমন ধরো, প্রথম প্রভার তারা দ্বিতীয় প্রভার তারার চেয়ে 2.51 গুণ বেশি উজ্জ্বল, দ্বিতীয় প্রভার তারা তৃতীয় প্রভার তারার চেয়ে 2.51 গুণ বেশি উজ্জ্বল, ইত্যাদি। পরে যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোক করে দেখা গেল এমনও তারা আছে যার ঔজ্জ্বল্য প্রথম প্রভার তারার ঔজ্জ্বল্যের চেয়েও বেশি। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন শূন্য প্রভার তারা। এই হিসাবে আকাশের অন্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলির

ঔজ্জ্বল্যের মানও ঠিক একইভাবে দেওয়া হলো। এখানে শূন্য প্রভার তারার চেয়েও উজ্জ্বল জোতিষ্ককে দেওয়া হলো নেগেটিভ বা বিয়োগ প্রভার মান। যেমন ধরো, আকাশের উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের মান—1.43, শুক্র গ্রহের (যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল) —4.4, পূর্ণিমার চাঁদের —12.6, সূর্যের —26.8। এখানে একটা কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। তারার প্রভার মান বা সংখ্যা যত বেশি, তার উজ্জ্বলতা তত কম। সংখ্যা যত কম, উজ্জ্বলতা তত বেশি।

যে কোনও একটি তারামণ্ডলের তারাগুলিকে তাদের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে চিহ্নিত করা হয় গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে। যেমন ধরো সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে বলা হয় আলফা (α), তার চেয়ে কম উজ্জ্বল তারাটিকে বিটা (β), তার পরেরটিকে গামা (γ) ইত্যাদি। অবশ্য বেশিরভাগ উজ্জ্বল তারাদেরই ডাক নাম আছে,



ছবি—2 তারাদের নামকরণ

যেমন বৃহৎ কুকুর মণ্ডলের আলফা তারাটির নাম 'লুব্ধক' বৃশ্চিক রাশির আলফা তারাটির নাম 'জ্যেষ্ঠা' ইত্যাদি।

ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ছাড়াও আরও যে জিনিষটা সহজেই চোখে পড়ে তা হলো তারাদের রংএর পার্থক্য। একটু লক্ষ করলেই দেখতে

পাবে যে সব তারার রং এক নয়। কোনওটা নীলচে সাদা, কোনওটা একটু হলদেটে আবার কোনওটার রং লালচে। কয়েকটি তারামণ্ডলে এ পার্থক্যটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। যেমন ধরো, কালপুরুষ মণ্ডলের দুটি উজ্জ্বল তারা বাণরাজা ও আর্দ্রা। প্রথমটির রং উজ্জ্বল নীলচে সাদা, অপরটি লালচে হলুদ রং এর। মিথুন রাশির দুটি প্রধান তারা প্রথম ও দ্বিতীয় পুনর্বসুর বেলায়ও একই ব্যাপার। দুটির মধ্যে বেশী উজ্জ্বল প্রথম পুনর্বসু লালচে হলুদ রং এর, দ্বিতীয় পুনর্বসুর রং নীলচে সাদা। বৃশ্চিক রাশির প্রধান তারা জ্যেষ্ঠার রং গাঢ় লালচে যা সহজেই চোখে পড়ে। আবার আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের রং ধবধবে সাদা।

তারাদের মধ্যে এই যে রং এর পার্থক্য এটা হয় তাদের উপরি-তলের তাপমানের তারতম্যের দরুণ। যে সব তারার তাপমান খুব বেশী (25,000 ডিগ্রী বা তারও বেশী) তাদের রং হয় নীলচে সাদা। অপর দিকে, যে সব তারার তাপমান খুব কম (3,000 ডিগ্রী বা তারও কম) তাদের রং হয় গাঢ় লালচে হলুদ। ব্যাপারটা অনেকটা এক খণ্ড লোহাকে গরম করার মত। প্রথমে সেটা লাল হয়, তারপর তাপমান বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার রং বদলায়। লাল থেকে লালচে হলুদ তারপর হলদে এবং সব শেষে উজ্জ্বল সাদা আলো বেরিয়ে আসে উত্তপ্ত লোহার খণ্ডটি থেকে। তারাদের বেলায় এটা হয় উত্তপ্ত গ্যাস পিণ্ডের তাপমানের তারতম্যের দরুণ।

আরও একটা ব্যাপার আছে। দেখা গেছে, যে সব তারার তাপমান কম, অর্থাৎ যাদের রং হলদে বা কমলা আয়তনে সে সব তারা বিশাল হয়। সে জন্য তাদের 'দানব' তারাও বলা হয়। আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা এরা হলো 'লাল দানব' তারা। অবশ্য এ নিয়মের ব্যাতিক্রম আছে। এমন সব কমলা রং এর তারা আছে যারা আয়তনে খুবই ছোট। এসব তারাদের বলা হয় 'লাল বামন'। তবে তাপমান কম এবং আয়তনে ছোট হওয়ার দরুন এসব তারার ঔজ্জ্বল্য খুবই কম হয়। সেণ্টরাস্ তারামণ্ডলের 'প্রক্সিমা সেণ্টরি' তারাটি এই শ্রেণীভুক্ত।

রাতের আকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তার নক্‌শাটা ক্রমাগতই বদলে যাচ্ছে। যেমন ধরো আগের পাতার ছবিতে যে নক্‌শা দেখানো হয়েছে সেটা দেখা যাবে রাত 9 টায় কেবলমাত্র 1 জুন তারিখে। পরের দিন, অর্থাৎ 2 জুন রাত 9 টায় কিন্তু ঐ নক্‌শা বদলে যাবে। কারণ প্রতিদিন আকাশের তারামণ্ডলগুলো পশ্চিম দিকে প্রায় এক ডিগ্রী সরে যায়। এটা হয় সূর্যের চারপাশে কক্ষপথে পৃথিবীর বার্ষিক গতির দরুন। আর এরই ফলে বছরের বিভিন্ন মাসে আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়।

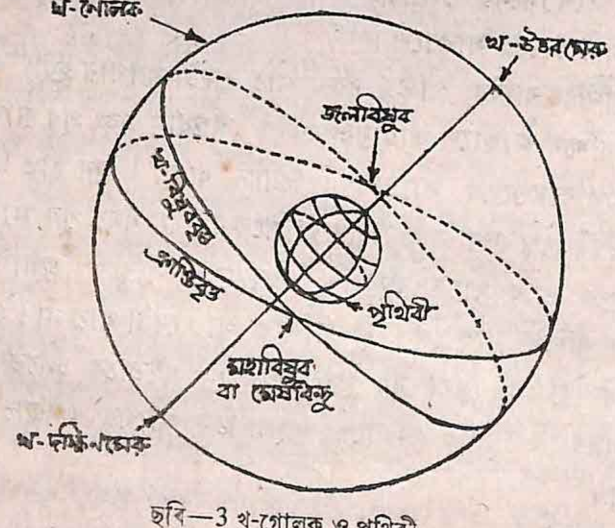
একটা কথা অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে। পৃথিবী থেকে আমরা তারা কেবল রাতের আকাশে দেখতে পাই। কারণ দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তেজে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আকাশে তারা চোখে পড়ে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দিনের বেলা আকাশে তারা থাকে না। পৃথিবীর চারপাশে যদি বায়ুমণ্ডল না থাকত তবে দিনের বেলাতেও আমরা তারা দেখতে পেতাম, যেমন দেখা যায় চাঁদের আকাশে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির দরুন আর একটা ব্যাপার হয়। একে একে পশ্চিম আকাশে তারামণ্ডলগুলির অন্তর্ধান এবং পূব আকাশে নতুন তারামণ্ডলের আবির্ভাব। যেমন ধরো, 1 জুন রাত 9 টায় পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায় মিথুন রাশিকে। সে সময় পূব আকাশে দিগন্তের ওপর থাকে ধনুরাশি। এক মাস পরে 1 জুলাই রাত 9 টায় পশ্চিম আকাশে মিথুনরাশিকে আর দেখা যায় না। ওদিকে পূব দিগন্তে তখন দেখা দেয় কুম্ভরাশিকে। এইভাবে চলতে চলতে এক বছর পর আবার আকাশের নক্‌শা ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

আকাশে তারাদের গতিপথ

একটা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশটাকে কেমন দেখায় তোমরা নিশ্চয়ই জানো। দেখায় ঠিক যেন একটা বিশাল অর্ধ গোলাকার উপুড় করা বাটির মতো। মাথার ওপরে আকাশটাকে মনে হয় সবচেয়ে উঁচু। আবার দিগন্তের কাছে যেন সে মাটি ছুঁয়ে আছে।

এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে কোনও জায়গা থেকে পুরো আকাশের কেবলমাত্র অর্ধেকটাই আমরা দেখতে পাই। বাকি অর্ধেকটা থাকে দিগন্তের নিচে। দুইএ মিলে বলতে পারো যে, আকাশটা হলো একটা বিশাল ফাঁপা গোলকের মতো যার ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আমাদের পৃথিবী (যেমন 3নং ছবিতে



ছবি—3 খ-গোলক ও পৃথিবী

দেখানো হয়েছে)। ঐ গোলকের মধ্যে আকাশের গায়েই আমরা দেখতে পাই চাঁদ, সূর্য আর গ্রহনক্ষত্রের আনাগোনা।

আসলে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক। আকাশের কোনও

নির্দিষ্ট আকার নেই, আর আকাশে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের দৈনিক গতিও কেবল আমাদের চোখের ভ্রম। কারণ পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে অনন্ত শূন্য যার কোনও সীমানা নেই। আকাশে চাঁদ, সূর্য তারা পূব থেকে পশ্চিমে চলছে মনে হয় পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘুরছে বলে। তবুও তারা চেনার জন্যে ঐ কাল্পনিক আকাশের ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে। যেমন ধরো তারাদের নিজ নিজ অবস্থান নির্ধারণের বেলায়।

পৃথিবীর চারপাশে আকাশের ঐ কাল্পনিক গোলককে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন 'খ-গোলক'। পৃথিবীর (ভূ-গোলকের) মতো খ-গোলকেরও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং বিষুববৃত্ত আছে যাদের বলা হয় যথাক্রমে খ-উত্তরমেরু, খ-দক্ষিণমেরু এবং খ-বিষুববৃত্ত। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে উত্তরমেরু বরাবর বাড়িয়ে দিলেই পাওয়া যায় খ-উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু বরাবর বাড়ালে পাওয়া যায় খ-দক্ষিণমেরু, আর পৃথিবীর বিষুবতলকে চারপাশে বাড়িয়ে দিলেই যায় খ-বিষুববৃত্ত।

এছাড়া, ভূগোলকের ওপর কাল্পনিক অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার মতো খ-গোলকের ওপরেও খ-বিষুববৃত্তের সমান্তরাল বরাবর বিষুবলম্ব এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিষুবাংশ রেখা আঁকা যেতে পারে, যার সাহায্যে আকাশে যে কোনও তারা বা জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্ণয় করা খুবই সহজ হয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা মানচিত্রে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা দেখে কোনও অজানা শহর খুঁজে বের করার মতো। তবে এখানে দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে।

ভূগোলকের বেলায় অক্ষাংশ মাপা হয় ডিগ্রীতে বিষুবরেখা থেকে নিয়ে উত্তরে এবং দক্ষিণে। যেমন ধরো কলকাতার অক্ষাংশ 22.5 ডিগ্রী উত্তর; অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্নের অক্ষাংশ 37·5 ডিগ্রী দক্ষিণ। এখানে বিষুবরেখার অক্ষাংশ ধরা হয় শূন্য ডিগ্রী। খ-গোলকের বেলায়ও বিষুবলম্ব মাপা হয় ডিগ্রীতে খ-বিষুববৃত্ত থেকে নিয়ে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে। কিন্তু এখানে উত্তর বিষুবলম্বের জন্যে (+) চিহ্ন এবং দক্ষিণ বিষুবলম্বের জন্য (−) চিহ্ন ব্যবহার করা

হয়। মানে, খ-বিষুববৃত্তের উত্তরে যত তারা আছে তাদের বিষুবলম্ব (+) আর দক্ষিণের তারাদের বিষুবলম্ব (−)। যেমন ধরো আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের বিষুবলম্ব —16.5 ডিগ্রী। মানে তারাটিকে দেখা যায় খ-বিষুববৃত্তের দক্ষিণে। আর একটি উজ্জ্বল তারা অভিজিৎ-এর বিষুবলম্ব + 38.5 ডিগ্রী। এ তারাটি আছে খ-বিষুববৃত্তের উত্তরে।

বিষুবাংশের বেলায় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। ভূগোলকের ওপর কোনও স্থানের দ্রাঘিমা মাপা হয় ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ মধ্য-রেখাকে কেন্দ্র করে পূব বা পশ্চিমে। যেমন ধরো, কলকাতার দ্রাঘিমা হলো 88 ডিগ্রী পূর্ব, মানে কলকাতা গ্রীনউইচের পূবে রয়েছে আর তাদের মধ্যেকার কৌণিক দূরত্ব 88 ডিগ্রী। একইভাবে, নিউইয়র্ক শহরের দ্রাঘিমা 74 ডিগ্রী পশ্চিম, মানে গ্রীনউইচের পশ্চিমে এ শহরটির কৌণিক দূরত্ব 74 ডিগ্রী। এখানে পূব বা পশ্চিম ধরা হচ্ছে গ্রীনউইচ মধ্যরেখাকে কেন্দ্র করে। খ-গোলকের বিষু-বাংশের বেলায় ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুটি হলো মহাবিষুব বা মেষবিন্দু। তবে এখানে মেষবিন্দুর পূব বা পশ্চিম হিসাবে বিষুবাংশ মাপা হয় না। তার বদলে, আকাশে মেষবিন্দুর মধ্যগমনের সময় থেকে নিয়ে যে কোনও তারার মধ্যগমনের মধ্যে যে সময় (ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড) লাগে সেটাই হলো সেই তারাটির বিষুবাংশ। যেমন ধরো, লুব্ধকের বিষুবাংশ 6 ঘণ্টা 40 মিনিট। এর মানে এই যে, আকাশে মেষবিন্দুর মধ্যগমনের 6 ঘণ্টা 40 মিনিট পরে লুব্ধকের মধ্যগমন হয়। এখানে লুব্ধকের মধ্যগমন বলতে কি বোঝায় একটু পরে বলছি।

বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ ছাড়া খ-গোলকের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো ক্রান্তিবৃত্ত। তোমারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আকাশে সূর্য সারা বছর এক জায়গায় থাকে না। শীতকালে সে দক্ষিণদিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার গরমকালে উত্তরে সরে যায়। যদি প্রতিদিন কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে, ধরো দুপুরে, আকাশে সূর্যের অবস্থান চিহ্নিত করে রাখা যায় তা হলে বছরের শেষে সেই বিন্দুগুলি যোগ

করলে যে বৃত্তটি পাওয়া যায় সেটাই হলো ক্রান্তিবৃত্ত। আমরা বলতে পারি যে, ক্রান্তিবৃত্ত হলো আকাশে সূর্যের চলার পথ। তা ছাড়া ঐ ক্রান্তিবৃত্তের ওপরেই দেখতে পাওয়া যায় রাশিচক্রের বারটি রাশিকে।

খ-গোলকের ওপর ক্রান্তিবৃত্তটি খ-বিষুববৃত্তের সঙ্গে 23.5 ডিগ্রী কেণাকুণিভাবে রয়েছে। এখন, যদি তোমরা মনে রাখো যে পৃথিবীর অক্ষও তার কক্ষতলে 23·5 ডিগ্রী হেলে রয়েছে, তা হলেই বুঝতে পারবে দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কি। যদি পৃথিবীর অক্ষ হেলে না থাকত তা হলে আকাশে সূর্য সারা বছর একই জায়গায়, ঠিক বিষুবরেখার ওপরে থাকত। তা ছাড়া ক্রান্তিবৃত্ত আর খ-বিষুববৃত্তও তা হলে একই হত।

আড়াআড়িভাবে থাকার দরুন ক্রান্তিবৃত্ত খ-বিষুববৃত্তকে দুটো বিন্দুতে ছেদ করে, যাদের বলা হয় বিষুববিন্দু। এদের মধ্যে একটি হলো মহাবিষুব এবং অন্যটি জলবিষুব। এই দুটি বিন্দুতে যখন সূর্য আসে তখন সে থাকে আকাশে ঠিক বিষুববৃত্তের ওপর। ফলে বছরে দুটি দিনে —21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর— পৃথিবীর সব জায়গায় দিন-রাত্রি সমান হয়।

তারা চেনার জন্যে আরও দুটো জিনিস চিনে নেওয়া দরকার। সেগুলো হলো সুবিন্দু এবং খ-মধ্যরেখা। প্রথমটি হলো মাথার ঠিক ওপরে আকাশে একটা কাল্পনিক বিন্দু। দ্বিতীয়টি হলো একটি কাল্পনিক রেখা যা সুবিন্দুকে ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তের সঙ্গে যোগ করছে। খ-মধ্যরেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্ক প্রতিদিন একবার, দিনের বেলায়ই হোক কিংবা রাত্রে, ঐ রেখা পূব থেকে পশ্চিমে পার হয়, যাকে বলা হয় মধ্যগমন। এখানে মনে রেখো মধ্যগমনের সময় যে কোনও জ্যোতিষ্ক আকাশে দক্ষিণ দিগন্তের ওপর সর্বোচ্চবিন্দুতে থাকে, আর সেজন্যে মধ্যগমনই হলো যে কোনও তারামণ্ডলকে চিনে নেওয়ার সবচেয়ে ভাল সময়।

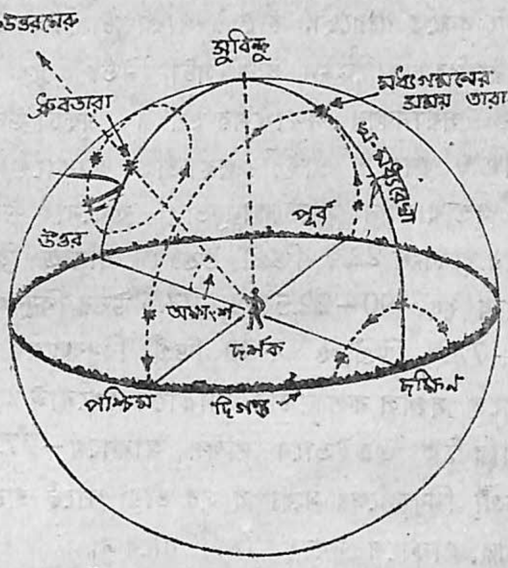
এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা হলো সেসব তোমাদের কাছে হয়তো একটু জটিল মনে হতে পারে। তোমরা হয়তো ভাবছ যে, শুধু চোখে তারা চেনার জন্যে এসবের আবার দরকার কি? দরকার হয়তো এখনই পড়বে না। তবে একটু চেষ্টা করে যদি ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারো তা হলে দেখবে আকাশে তারাদের চালচলন বুঝতে কত সুবিধে হয়ে যাবে।

এবারে এসো দেখা যাক, রাতের আকাশে তারাদের চলন কেমন দেখায়। আগেই বলেছি, পূব থেকে পশ্চিমে তারাদের চলন হলো আমাদের চোখের ভ্রম। পৃথিবী নিজের অক্ষে পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছে বলেই অমন মনে হয়। আকাশের সব তারাই কিন্তু পূব থেকে পশ্চিমে চলতে দেখায় না। সেটা নির্ভর করে আকাশে কোন জায়গায় তারাটি আছে, মানে তার বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ কি, তার ওপর। যেমন ধরো উত্তরে ধ্রুবতারার বেলায়। পৃথিবীর আকাশে ধ্রুবতারাকে দেখে মনে হয় যেন স্থির হয়ে আছে। এর কারণ এই যে, খ-গোলকে ধ্রুবতারার অবস্থান ঠিক খ-উত্তরমেরুর ওপর (আসলে একটু পাশে), অর্থাৎ সে আছে পৃথিবীর অক্ষ বরাবর ঠিক উত্তরমেরুর ওপর। এর ফলে আকাশে তার অবস্থানের ওপর পৃথিবীর আহ্নিক গতির কোনও প্রভাব পড়ে না।

আকাশের বাকি সব তারা মনে হয় যেন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ঘুরছে। এর ফলে কিছু তারা পূব দিকে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। কিছু উত্তর পূবে উঠে উত্তরপশ্চিমে অস্ত যায়, আবার কিছু দক্ষিণপূবে উঠে দক্ষিণপশ্চিমে অস্ত যায়। কোন্ তারা কোন দিকে ওঠে আর অস্ত যায় সেটা নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপর। এক : তারাটির বিষুবলম্ব কি এবং দুই : কোথা থেকে দেখা হচ্ছে।

যেমন ধরো যদি উত্তরমেরুর থেকে আমরা আকাশটাকে দেখি, তবে দেখব যে ধ্রুবতারা রয়েছে ঠিক মাথার ওপর। উত্তর আকাশের বাকি সব তারা তাকে ঘিরে দিগন্তের সমান্তরালে পাক খেতে দেখা যাবে। সেগুলি কখনোই অস্ত যাবে না।

অবশ্য তাদের দেখতে পাওয়া যাবে কেবলমাত্র যখন সূর্য দিগন্তের নিচে থাকবে তখনই। আর একটা কথা, এখান থেকে দক্ষিণ আকাশের কোনও তারাই কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ সেগুলি সারা বছরই দিগন্তের নিচে থাকবে।



ছবি—4 আকাশে তারার চলন

আবার, যদি আমরা বিষুবরেখার ওপর কোনও জায়গা থেকে দেখি, তা হলে আকাশে তারাদের চলন হবে একেবারে অন্যরকম। সেখান থেকে ধ্রুবতারাকে দেখা যাবে একেবারে উত্তর দিগন্তে। বাকি সব তারা আকাশে চলবে ঠিক পূব-পশ্চিম রেখা বরাবর। বিষুব-রেখা থেকে আকাশ দেখার একটা বিশেষ সুবিধা হলো উত্তর ও দক্ষিণ আকাশের প্রায় সমস্ত তারাই এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক মাঝামাঝি অক্ষাংশের কোনও জায়গা থেকে আকাশটা কেমন দেখাবে। বিষুবরেখার উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা কখনোই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ

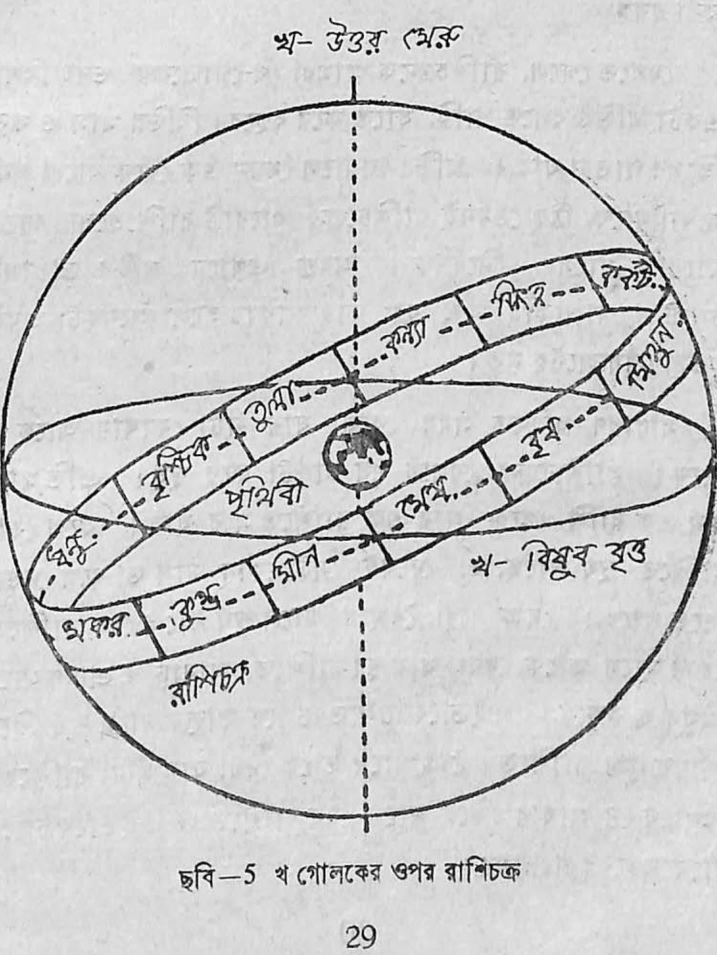
সেগুলি কখনোই দিগন্তের ওপরে ওঠে না। অপরদিকে উত্তর আকাশের কিছু তারা কখনোই অস্ত যায় না। (অবশ্য তাদের দেখা যায় কেবল রাত্তিরে)। বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকেও একই ব্যাপার। সেখান থেকে দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা কখনোই অস্ত যায় না, আবার উত্তর আকাশের কিছু তারা কখনোই উদয় হয় না।

সুতরাং বুঝতে পারছো, রাতের আকাশটা কেমন দেখাবে আর তাতে তারাদের চলন কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে যেখান থেকে দেখা হচ্ছে সেখানকার অক্ষাংশের ওপর। একটা উদারহণ দিই। ধরো আমরা জানতে চাই কলকাতার আকাশে কোন্ তারা কখনোই অস্ত যাবে না আর কোন্ তারা কখনোই উদয় হবে না। কলকাতার অক্ষাংশ 22.5 ডিগ্রী উত্তর। সামান্য হিসেব করলেই দেখা যাবে যে, (90 – 22.5) বা 77.5 উত্তর বিষুবলম্বের ওপরে, মানে +77.5 ডিগ্রী ও +90 ডিগ্রী বিষুবলম্বের মধ্যে, যে সব তারা আছে সেগুলি কলকাতার আকাশে কখনোই অস্ত যাবে না।

আবার ঠিক একইভাবে দক্ষিণ আকাশে –77.5 ডিগ্রী এবং —90ডিগ্রী বিষুবলম্বের মধ্যে যে সব তারা আছে তাদের কখনোই কলকাতার আকাশে দেখতে পাওয়া যাবে না।

রাশিচক্র ও নক্ষত্র

ক্রান্তিবৃত্ত কি সে বিষয় তোমাদের আগেই বলেছি। ক্রান্তিবৃত্তকে আমরা আকাশে সূর্যের চলনপথও বলতে পারি, যার ওপরে সূর্যকে প্রতিদিন প্রায় এক ডিগ্রী করে পশ্চিম থেকে পূবে সরে যেতে দেখা যায়। এইভাবে সরতে সরতে 365 দিনে, মানে ঠিক এক বছরে, সূর্য আবার আকাশের ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসে। ক্রান্তি-



ছবি—5 খ গোলকের ওপর রাশিচক্র

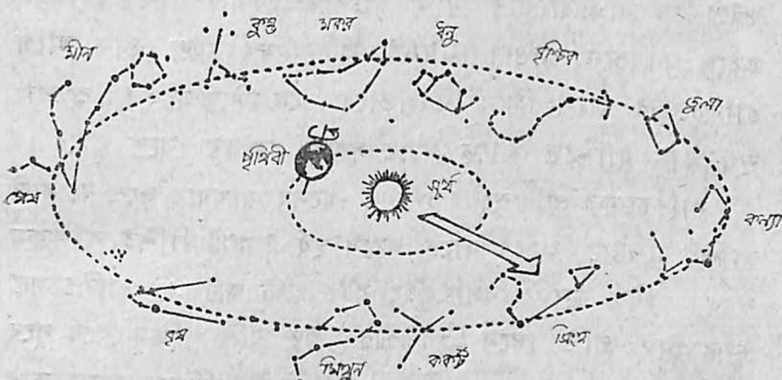
বৃত্তের দুপাশে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রায় 9 ডিগ্রী পর্যন্ত প্রায় 18 ডিগ্রী চওড়া আকাশের এলাকাকেই বলা হয় রাশিচক্র। আকাশের 88টি তারামণ্ডলের মধ্যে 12টিকে (যাদের 'রাশি'ও বলা হয়) দেখা যায় ঐ রাশিচক্রের ওপর। বারোটি রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

প্রাচীনকালে মানুষের কাছে রাশিচক্রের তারামণ্ডলগুলি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে সময় ঐ রাশিচক্রের ওপর চাঁদ সূর্য ইত্যাদির অবস্থানই ছিল মাস ঋতু বছর জানবার একমাত্র উপায়। আজও ঐ নিয়ম ক্যালেণ্ডার ও পঞ্জিকা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

দেখতে গেলে, রাশিচক্রকে আমরা খ-গোলকের ওপর বিশাল একটা ঘড়িও বলতে পারি, যাতে করে বছরের বিভিন্ন মাস ও ঋতুর হিসেব পাওয়া যায়। ঘড়ির ডায়ালে যেমন এক থেকে বারো পর্যন্ত সংখ্যা থাকে, ঠিক তেমনই রাশিচক্রের বারোটি রাশি হলো বছরের বারোটি মাসের নির্দেশক। অবশ্য এখানে ঘড়ির ডায়ালটা চ্যাপ্টা, গোলাকার নয়, বরং তার আকার হলো অনেকটা একটা চওড়া ব্রেসলেটের মত।

সাধারণ ঘড়িতে সময় বোঝা যায় কাঁটা কোথায় আছে তা দেখে। রাশিচক্রের বেলায় সে কাজটা করে সূর্য। প্রতি মাসে সূর্য এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে সরে যায়। ফলে কোন রাশিতে সূর্য আছে, তা দেখেই সেটা কোন্ মাস তা বলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে সূর্য থাকে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাকে দেখা যায় বৃষ রাশিতে, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে মিথুন ও কর্কটে। এইভাবে চলতে চলতে ফাল্গুন মাসে সূর্য গিয়ে পৌঁছয় কুম্ভ রাশিতে। চৈত্র মাসে তাকে দেখা যায় মীন রাশিতে। বৈশাখে সে আবার ফিরে আসে মেষ রাশিতে। এইভাবে চলতে থাকে বছরের পর বছর।

অবশ্য একটা কথা মনে রেখ। এই যে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সূর্যের চলন, এটা কিন্তু কেবলমাত্র একটা প্রতীয়মান ঘটনা। আসলে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরার দরুনই ওরকম মনে হয়। কেমন করে ওটা হয় নিচের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।



ছবি—6 রাশিচক্রের রাশিগুলির মধ্য দিয়ে সূর্যের আপাত গতি

তোমরা হয়তো ভাবছ যে, সূর্য কোন রাশিতে আছে তা দেখে বুঝবে কি করে। কারণ সূর্যের আলোয় তো আর আকাশে রাশি বা তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। কিন্তু একটা সোজা উপায় আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, পূর্ণিমার দিন চাঁদ থাকে সূর্যের উল্টো দিকে, মানে সূর্য থেকে ঠিক 180 ডিগ্রী দূরে। এখন যদি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ কোন্ রাশিতে আছে দেখে নেওয়া যায় তা হলে সূর্য সে সময় কোন্ রাশিতে আছে তা সহজেই বের করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ যে রাশিতে চাঁদ আছে তার পরে সপ্তম রাশিতেই থাকবে সূর্য। যেমন ধরো, কোনও পূর্ণিমায় চাঁদকে দেখা গেল মকর রাশিতে, তা হলে বুঝে নিতে হবে যে সূর্য সে সময় রয়েছে কর্কট রাশিতে।

এর থেকেও সোজা একটা উপায় আছে, যাতে করে পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেও বলে দেওয়া যেতে পারে সূর্য কোথায় আছে। তোমাদের আগে বলেছি যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্ক

ও তারামণ্ডল প্রতিদিন একবার খ- মধ্যরেখাকে পূব থেকে পশ্চিমে পার করে যাকে বলা হয় মধ্যগমন। সূর্য মধ্যগমন করে ঠিক ছুপুরে। সুতরাং সূর্যের ঠিক উল্টোদিকে রাশিচক্রে যে তারামণ্ডলটি আছে, মানে সূর্য যে রাশিতে আছে তার থেকে সপ্তম রাশিটি, মধ্যগমন করবে ঠিক মাঝ রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে কোন্ রাশিটি মধ্যগমন করছে তা চিনে নেওয়া মোটেই কঠিন নয় (অবশ্য তার আগে রাশিচক্রের রাশিগুলিকে ভালভাবে চিনে নিতে হবে)। সুতরাং সূর্য কোন রাশিতে আছে সেটাও সহজে বের করা যেতে পারে।

রাশিচক্রের ওপর সূর্যের চলনের হিসেব রাখবার জন্যে বারোটি রাশিই যথেষ্ট। কারণ বারো মাসে সূর্য ঐ ক'টি রাশিই অতিক্রম করে। কিন্তু চাঁদের বেলায় হিসেবটা একটু জটিল। রাশিচক্রের ওপর চাঁদ প্রতি দিনে 13 ডিগ্রীর কিছু বেশি পশ্চিম থেকে পূবে সরে যায়। ফলে এক রাশি বা 30 ডিগ্রী অতিক্রম করতে তার লাগে প্রায় সোয়া ছ'দিন। মানে, পুরো রাশিচক্রের বারোটি রাশি পেরিয়ে আসতে চাঁদের লাগে প্রায় 27 দিন 8 ঘণ্টা। এরকম একটা হিসাব রাখতে কত অসুবিধা তা বুঝতেই পারছ। এই অসুবিধা দূর করার জন্যেই বোধ হয় প্রাচীনকালের বৈদিক হিন্দুরা রাশিচক্রকে 27টি অংশে ভাগ করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় এক একটি 'নক্ষত্র'। প্রতিটি নক্ষত্রে চাঁদকে মাত্র এক দিন করে দেখা যায়। যেমন ধরো, আজ যদি চাঁদকে দেখা যায় কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তবে আগামীকাল সে থাকবে রোহিণী নক্ষত্রে, পরের দিন সে চলে যাবে মৃগশিরা নক্ষত্রে। এইভাবে চলতে চলতে 27 ⅓ দিন পরে সে আবার ফিরে আসবে কৃত্তিকা নক্ষত্রে।

বলা হয় যে রাশিচক্রের 27টি চান্দ্র নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে 27টি উজ্জ্বল তারার নামে। আসলে কিন্তু সব কটি চান্দ্র নক্ষত্রেই যে উজ্জ্বল তারা আছে তা নয়। বরং কয়েকটি নক্ষত্র এতই অনুজ্জ্বল যে শুধু চোখে তাদের চেনা বেশ কঠিন ব্যাপার। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'নক্ষত্র' গুলিকে চিহ্নিত করা হয় বিভিন্ন তারামণ্ডলের 27টি

উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল তারা দিয়ে। এদের বেশির ভাগই হলো রাশিচক্রের বাইরের তারামণ্ডলের তারা। তবুও সে সব তারাদের যদি চিনে নিতে পারো তা হলে চাঁদের 'নক্ষত্র'-গুলিকেও সহজে চিনে নিতে পারবে।

চান্দ্র নক্ষত্রের বিষয় একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি। তা হলো এই যে, আমাদের ভারতীয় ক্যালেণ্ডারে মাসের নামগুলি, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদি রাখা হয়েছে ঐ 27টির মধ্যে 12টি চান্দ্র নক্ষত্রের নামনুসারে। হিসেবটা হলো এরকম। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যে নক্ষত্রে থাকে সেই নক্ষত্রের নামানুসারেই মাসের নাম। যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন চাঁদকে দেখা যায় বিশাখা নক্ষত্রে, জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রে। এই ভাবে শ্রাবণ মাসে শ্রবণা নক্ষত্রে, আশ্বিন মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে, কার্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে, পৌষ মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখা যায়। অবশ্য এখানে আমরা মাস বলতে চান্দ্রমাসের কথাই বলছি, যাতে দিনের সংখ্যা $29\frac{1}{2}$। সাধারণ ক্যালেণ্ডারের মাসের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু খাটে না।

রাশিচক্রের রাশি ও নক্ষত্রের বিষয় যে সব কথা বললাম তা থেকে বুঝতেই পারছ যে, আমাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে তাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আজও আমাদের দেশে পূজোপার্বণ ইত্যাদির তারিখ নির্ণয় করা হয় রাশিচক্রের ওপর চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ। রাশি-নক্ষত্রের সঙ্গে কোনও দৈব ঘটনার সম্পর্ক নেই। আর কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ আছে তার সঙ্গে মানুষের ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ নেই। ওসব হলো কেবল মাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা, যার ব্যাখ্যা আজ আমাদের কাছে আছে। আকাশের তারামণ্ডলগুলিকে যদি চিনে নিতে পারো, তা হলে বুঝতে পারবে সে সব ব্যাখ্যা কত সহজ।

উত্তর আকাশের তারামণ্ডল

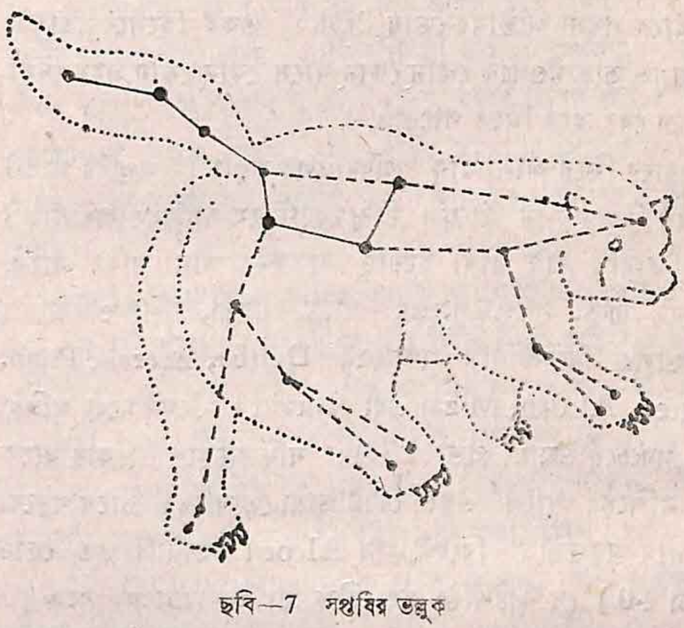
আকাশের তারামণ্ডলগুলির যে ক'টিকে খুব সহজেই চিনে নেওয়া যায় তাদের দুটি হলো সপ্তর্ষি মণ্ডল বা Ursa Major এবং ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia)। এ দুটিকে দেখা যায় ধ্রুবতারা বা Pole Star-এর দুপাশে। উত্তরের দেশগুলি থেকে (যে সব জায়গার অক্ষাংশ 40 ডিগ্রী উত্তরের বেশি) সপ্তর্ষি ও ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডল দুটিকে সারা বছরই এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সেখানের আকাশে এদুটি কখনোই অস্ত যায় না। কিন্তু ভারত থেকে এদুটিকে একসঙ্গে কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ সময়ই তাদের একটিই দিগন্তের ওপরে থাকে।

সপ্তর্ষির নাম থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তারামণ্ডলটি সাতটি তারা নিয়ে তৈরী। আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। আধুনিক হিসাবে সপ্তর্ষির সাতটি তারা হলো আরো বড় একটি তারামণ্ডলের অংশমাত্র। বড় তারামণ্ডলটির নাম Ursa Major বা 'বৃহৎ ভাল্লুক'। তারাগুলি দিয়ে ভাল্লুকের আকৃতি কি করে তৈরী হয়েছে তা ছবিতে দেখানো হয়েছে। তবে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে। ভাল্লুকের আসলে লেজ থাকে না, কিন্তু ছবিতে সপ্তর্ষির তিনটি তারাকে দেখানো হয়েছে ভাল্লুকের লেজের অংশ হিসেবে। এটা কেমন করে এলো তা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, একটু লক্ষ্য করে দেখলে পরে হয়তো তোমরা সপ্তর্ষির ঐ লেজওয়ালা ভাল্লুকটিকে চিনে নিতে পারবে। কিন্তু তার আগে এসো চিনে নেওয়া যাক সপ্তর্ষির সাত 'ঋষি'কে।

সাতটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী সপ্তর্ষিকে দেখতে ঠিক যেন একটা প্রশ্নচিহ্নের (?) মত। অবশ্য এই আকৃতিটা দেখতে পাওয়া যায়

কেবলমাত্র তারামণ্ডলটি যখন উদয় হয় সে সময়। অস্ত যাবার সময় আকৃতিটা উল্টো (¿) দেখায়।

শীতের পর সপ্তর্ষিকে উত্তরপূর্ব আকাশে দেখতে পাওয়া যায় মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে। তবে তারামণ্ডলটিকে দেখার সবচেয়ে ভালো সময় হলো গ্রীষ্মকাল। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে রাত 8টা থেকে 10 টার মধ্যে তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক মাথার ওপরে, মধ্যগমনের সময়। এই সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলে পুরো ভাল্লুকের প্রায় সবকটি তারাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।



ছবি—7 সপ্তর্ষির ভল্লুক

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। আগে বলেছি যে, রাতের আকাশে তারামণ্ডলগুলি প্রতিদিন 1°ডিগ্রী করে পশ্চিমে সরে যায়। ফলে পশ্চিম আকাশে একে একে তারামণ্ডলগুলির অন্তর্ধান এবং পুব আকাশে একে একে তারামণ্ডলের আবির্ভাব হয়। এর ফলে আরও একটা ব্যাপার হয়। যে সব তারামণ্ডল গ্রীষ্মকালে

সন্ধ্যের পর রাতের আকাশে দেখতে পাওয়া যায় তাদের ঠিক একই জায়গায় শীতকালে ভোর আকাশে দেখা যায়। আবার যে তারামণ্ডলগুলিকে শীতকালে রাতে দেখা যায় তাদের দেখতে পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে ভোরে। যেমন ধরো, মীন রাশিকে দেখা যায় জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যের পর। কিন্তু আগস্ট বা সেপ্টেমবর মাসে ভোরের আকাশেও তারামণ্ডলটিকে তোমরা দেখতে পারো। এইভাবে একই তারামণ্ডলকে বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে একই জায়গায় কোন্ কোন্ সময়ে দেখা যাবে তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হলো। তালিকা থেকে দেখতে পাবে যে, পয়লা ফেব্রুয়ারি যে তারামণ্ডলগুলি রাত 7টায় দেখতে পাওয়া যাবে তাদের আবার দেখা যাবে পয়লা অক্টোবর ভোর 3টেয়। একই হিসেবে তোমরা যে কোনও তারামণ্ডলকে কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ সময় দেখা যাবে তা বের করে নিতে পারো।

এবারে ফিরে আসা যাক্ সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথায়। সপ্তর্ষির সাতটি তারারই নিজস্ব নাম আছে। হিন্দু জ্যোতিষে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি উজ্জল তারার নাম রাখা হয়েছে সাতজন আর্য ঋষির নামে, যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। তারাগুলির বিদেশী নাম যথাক্রমে **Duhbe, Merak, Phad, Megrez, Alioth, Mizar** এবং **Alkaid**। এদের মধ্যে অঙ্গিরা হলো সবচেয়ে উজ্জল (প্রভা 1·79)। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে বশিষ্ঠের পাশে একটা ছোট্ট তারা তোমাদের চোখে পড়বে, তার নাম অরুন্ধতী। বিদেশী নাম Alcor। তারাটি এত ছোট (প্রভা 4·0) যে দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ না হলে চোখেই পড়ে না। শোনা যায় প্রাচীনকালে আরব দেশে সৈন্যদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার জন্যে এর ব্যবহার হত।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুটি তারা ক্রতু ও পুলহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদুটিকে 'নির্দেশক' হিসেবে ব্যবহার করে ধ্রুবতারাকে সহজেই খুঁজে বের করা যেতে পারে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। ধ্রুবতারা

নিজে খুব একটা উজ্জ্বল তারা নয়, সেজন্যে সপ্তর্ষি ছাড়া তাকে খুঁজে বের করাটা একটু কঠিন হতে পারে।
সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যগমন করে পয়লা মে রাত 9টায় এবং পয়লা জানুয়ারী ভোর 5টায়।

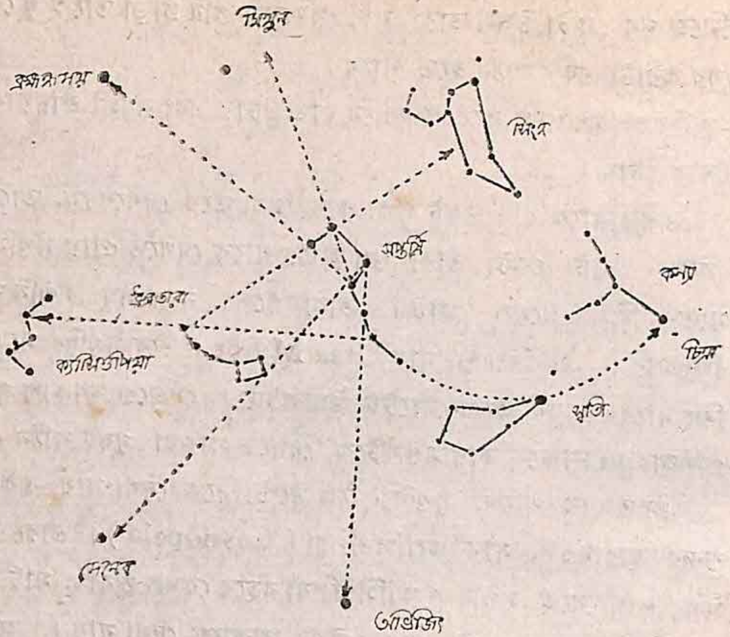
ধ্রুবতারাকে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখ, তবে দেখবে যে, তাকে নিয়েও ছোট একটা তারামণ্ডল আছে যাকে দেখতে প্রায় সপ্তর্ষির মতো, কিন্তু অনেক ছোট। তারামণ্ডলের নাম লঘু সপ্তর্ষি বা শিশুমার। এর বিদেশী নাম Ursa Minor। তবে সপ্তর্ষির মতো শিশুমারের সাতটি তারা মোটেই উজ্জ্বল নয়। সেজন্যে আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন।

ধ্রুবতারার পাশে, সপ্তর্ষির ঠিক উল্টোদিকে দেখা যায় একটি সুন্দর তারামণ্ডল, নাম ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia)। ভারতের উত্তর ভাগ থেকে সপ্তর্ষি ও ক্যাসিওপিয়া বছরে কেবল দু'বার, মার্চ ও সেপ্টেমবর মাসে, একই সময় উত্তর আকাশে দেখা যায়। অন্য সময় এদের একটিকেই দেখতে পাওয়া যায়, অপরটি থাকে দিগন্তের নিচে।

সপ্তর্ষির তুলনায় ক্যাসিওপিয়া আকারে অনেক ছোট। কিন্তু এর সব কটি তারা খুব উজ্জ্বল, সেজন্যে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। পাঁচটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত ক্যাসিওপিয়ার আকৃতি অনেকটা ইংরেজী অক্ষর 'M' এর মতো, যা তোমরা সহজেই চিনে নিতে পারবে। অবশ্য বলা হয় তারামণ্ডলটিতে কৌচে বসা এক মহিলার আকৃতি দেখা যায়, তবে সেটা খুঁজে বের করা মুস্কিল।

ক্যাসিওপিয়া মধ্যগমন করে পয়লা নভেম্বর রাত **10টায়** এবং পয়লা আগষ্ট ভোর 4টায়।

সপ্তর্ষি এবং ক্যাসিওপিয়া ছাড়াও ধ্রুবতারার কাছাকাছি আরও দু'টি তারামণ্ডল আছে। কিন্তু সেগুলি এত ক্ষীণ যে আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে তাদের দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি তাদের না খুঁজে পাও তবে হতাশ হবার কিছু নেই। এখনকার মতো



ছবি—৪

উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি ও ক্যাসিওপিয়াকে যদি তোমরা ভালো করে চিনে নিতে পারো তবে তাদের কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি তারামণ্ডল খুঁজে নিতে পারবে যেমন ওপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

গ্রীষ্মের আকাশ

এর আগে তোমাদের উত্তর আকাশের কয়েকটি তারামণ্ডলের বিষয় বলেছি। এবারে আকাশের বাকি তারামণ্ডলগুলি কেমন করে চিনবে সে কথা বলবো। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, বিভিন্ন মাসে রাতের আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তারামণ্ডলগুলিকে 6 ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে আলাদা আলাদা চিনে নিতে চেষ্টা করবো। এভাবে তাদের চিনে নিতে অনেক সুবিধে হবে।

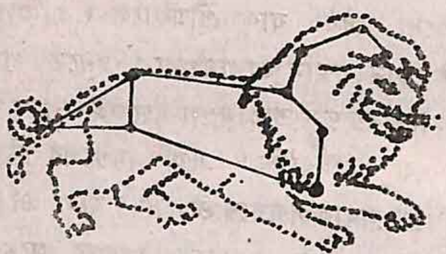
প্রথমেই এসো দেখা যাক্ গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-মে মাসে) রাতের আকাশে কোন্ কোন্ তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মের আকাশে যে দুটি তারামণ্ডল সহজেই চোখে পড়ে তাদের নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সিংহরাশি। সপ্তর্ষি মণ্ডলের বিষয় আগেই বলেছি। একে চিনে নেবার সবচেয়ে ভাল সময় হলো এপ্রিল-মে মাস যখন একে দেখতে পাবে উত্তর আকাশে দিগন্তের অনেক ওপরে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে সপ্তর্ষির সব কটি তারাই হয়ত চিনে নিতে পারবে। তারামণ্ডলে 'ভাল্লুক'-এর আকৃতিও এসময় সহজে চেনা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা মে রাত 10টায় এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 5টা নাগাদ।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঠিক দক্ষিণেই রয়েছে সিংহরাশি। সপ্তর্ষিমণ্ডলের 'নির্দেশক' তারা দুটি (পুলহ এবং ক্রতু)-কে ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিলেই রাশিটিকে দেখতে পাবে। তারামণ্ডলটিতে একটি সিংহের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে যেটা সহজেই চেনা যায়। তবে একে চিনে নেবার আরও সহজ উপায় আছে। সিংহ রাশির উজ্জ্বল তারাগুলিকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। পশ্চিম অংশের ছ'টি তারা নিয়ে একটি 'কাস্তে'র আকৃতি দেখতে

পাবে যার হাতলে রয়েছে একটি উজ্জ্বল তারা, মঘা (প্রভা 1·36)। এদিকটা হলো সিংহের মাথা। তারামণ্ডলের পূর্ব অংশে তিনটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে সমকোণি ত্রিভুজটাও সহজেই চোখে পড়ে। এদিকটায় রয়েছে সিংহের লেজের অংশ।

তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা মঘা রয়েছে সিংহের সামনের পায়ের দিকে। এটি একটি চান্দ্র নক্ষত্র। তারামণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা উত্তরফাল্গুনী (প্রভা 1·6)। এর বিদেশী নাম দেনেবোলা (Denebola)। এটিও চান্দ্র নক্ষত্রের একটি। একে দেখতে পাবে সিংহের লেজে। সিংহ রাশিতে যে তৃতীয় চান্দ্র নক্ষত্রটি রয়েছে তার নাম পূর্বফাল্গুনী (প্রভা 2·6)। এর বিদেশী নাম জোসমা (Zosma) গ্রীষ্মকালে সিংহরাশিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে



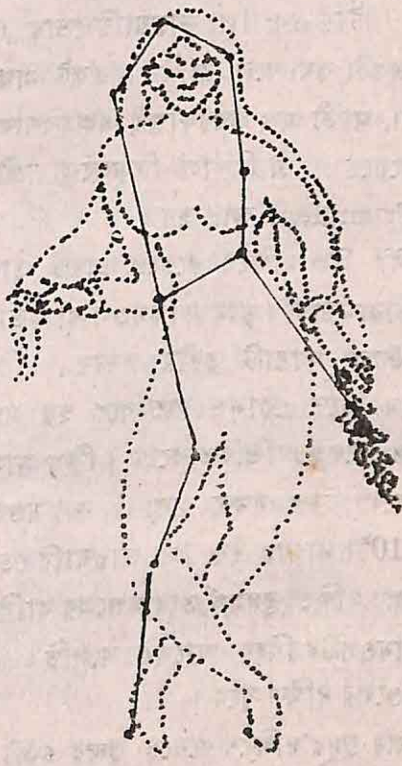
ছবি 9 সিংহ রাশি

তবে তারামণ্ডলে সিংহের আকৃতিকে চিনতে হলে দক্ষিণ মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। সিংহরাশি মধ্যগমন করে 1লা এপ্রিল রাত 10টায় এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 4টের সময়।

সিংহরাশির পূর্ব দিকে যে বড় তারামণ্ডলটিকে দেখতেপাবে তার নাম বুওটিস্ (Bootes)। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে তারামণ্ডলটিতে এক পশুচারকের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তবে চোখে দেখে সে রকম কিছু বোঝা যায় না। তারামণ্ডলের ছ'টি তারা নিয়ে এক বিশাল লম্বাকার ঘুড়ির আকৃতি চোখে পড়ে যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি রয়েছে ঘুড়ির লেজে। লালচে রং-এর

তারাটির নাম স্বাতী, প্রভা—0·06। এর বিদেশী নাম আর্কটারাস (Arcturus)। তারা হিসেবে স্বাতী খুবই বিশাল। এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় 30 গুণ। পৃথিবী থেকে এটি রয়েছে প্রায় 40 আলোকবর্ষ দূরে। স্বাতীও চান্দ্র নক্ষত্রগুলির একটি। বুওটিস্ মধ্যগমন করে 1লা জুন রাত 10টায় এবং 1লা মার্চ ভোর 4টে নাগাদ।

রাশিচক্রে সিংহের পরে রয়েছে কন্যারাশি। একে দেখতে পাবে সিংহরাশির দক্ষিণপূবে। তারামণ্ডলটিতে মাত্র একটাই উজ্জ্বল তারা রয়েছে যার নাম চিত্রা (প্রভা 1·2)। এর বিদেশী নাম স্প্যাইকা (Spica)।



ছবি—10 কন্যা রাশি

আকাশে চিত্রাকে খুঁজে বের করবার একটা সহজ উপায় আছে। প্রথমেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে দেখ। এর তিনটি তারা—অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচিকে যদি একটা রেখা দিয়ে জুড়ে দাও তবে একটা বৃত্তচাপের মত রেখা পাবে। ঐ রেখাকে যদি দক্ষিণ-পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলে কিছু দূরে স্বাতী নক্ষত্রে পৌঁছবে। এবার ঐ রেখাকে আরও খানিকটা দক্ষিণ বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই চিত্রা তারাটিকে খুঁজে পাবে (ছবি-8)। পৃথিবী থেকে চিত্রার দূরত্ব 220 আলোকবর্ষ। এটিও একটি চান্দ্র নক্ষত্র।

চিত্রা ছাড়া কন্যারাশিতে আরও ছ'টি তারা শুধু চোখে দেখা যায়। এদের মধ্যে পাঁচটি তারা এবং চিত্রাকে নিয়ে ইংরেজি—'Y' অক্ষরের আকৃতি সহজেই চোখে পড়ে। কন্যারাশি মধ্যগমন করে 1লা মে রাত 10টায় এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 6টায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে চিত্রা, স্বাতী এবং উত্তরফাল্গুনী এক বিশাল সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে রয়েছে। ঐ বিশাল ত্রিভুজকে "গ্রীষ্মের ত্রিভুজ" বা **Summer Triangle** ও বলা হয়।

কন্যারাশির ঠিক দক্ষিণে রয়েছে চারটি তারার একটি ছোট চতুর্ভুজ। তারামণ্ডলটির নাম কাকমণ্ডল বা কর্ভাস (**Corvus**)। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি তৃতীয় প্রভার। কিন্তু সেজন্য তারামণ্ডলটিকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কাকমণ্ডলকে কেউ কেউ হস্তা বলেই অভিহিত করেন। কিন্তু আসলে তারামণ্ডলের δ তারাটিই হলো চান্দ্র নক্ষত্র হস্তা। কাকমণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা মে রাত 10টা নাগাদ এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 6টা নাগাদ।

কাকমণ্ডলের দক্ষিণে হ্রদসর্প তারামণ্ডলের বাকি অংশটুকু দেখতে পাবে। তারামণ্ডলটির বিষয় আগেই বলেছি। এর পূর্ব প্রান্তটি রয়েছে কাকমণ্ডলের দক্ষিণ পূবে।

কাকমণ্ডলের সুদূর দক্ষিণে রয়েছে সুন্দর একটি তারামণ্ডল যার নাম দক্ষিণ ক্রস বা **Southern Cross**। তারামণ্ডলটিতে প্রথম

প্রভার একটি এবং দ্বিতীয় প্রভার দুটি তারা রয়েছে যাদের নিয়ে ক্রসের আকৃতির ছোট্ট তারামণ্ডলটিকে সহজেই চেনা যায়। অবশ্য দক্ষিণ খ-মেরুর খুব কাছে রয়েছে বলে কলকাতা বা উত্তর ভারতের কোনও স্থান থেকে একে দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র দক্ষিণ ভারত থেকেই একে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ক্রস মধ্যগমন করে 1লা মে রাত 10টায় এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 6টা নাগাদ।

দক্ষিণ আকাশের আর একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডল সেণ্টরাস্ (Centaurus)-কে দেখতে পাবে দক্ষিণ ক্রসের ঠিক পূবে। এ তারামণ্ডলটিতেও বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি প্রথম প্রভার তারা। এ তারামণ্ডলটিকেও কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারত থেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

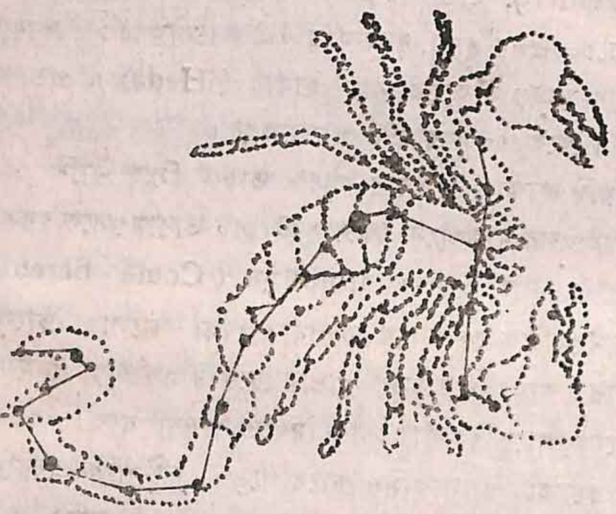
সেণ্টরাসের সর্বোজ্জ্বল তারাটির নাম আলফা সেণ্টরাই (Alpha Centauri), প্রভা—0·27। সূর্যকে বাদ দিলে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা, দূরত্ব মাত্র 4·2 আলোকবর্ষ। তারামণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারাটির নাম হাদার (Hadar), প্রভা 0·63। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 490 আলোকবর্ষ।

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে সিংহ রাশি ও বুওটিস্ তারামণ্ডলের মাঝখানে একটা খুবই ছোট তারামণ্ডলকে হয়ত দেখতে পাবে। নাম কোমা বারেনিসিস (Coma Berenices)। তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে কেবলমাত্র হাল্কা আলোর ছোপের মতই দেখায়। কারণ এতে চতুর্থ প্রভার চেয়ে উজ্জ্বল তারা নেই। কিন্তু বাইনোকুলারে এক ঝাঁক তারা দেখতে পাওয়া যায়। বড় দূরবিনে বেশ কয়েকটা গ্যালাক্‌সিও চোখে পড়ে। দৃষ্টি শক্তি প্রখর না হলে অবশ্য তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে খুঁজে বের করা সোজা নয়।

বর্ষার আকাশ

গ্রীষ্মের পরের ঋতু বর্ষা। আমাদের দেশে জুলাই আগস্ট এই দুই মাসই বর্ষার মাস বলে ধরা হয়। বুঝতেই পারছ এসময় বেশীর ভাগ সময়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। রাতের আকাশে তারা দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যদি এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কেটে যায় তবে আকাশ অদ্ভুত স্বচ্ছ দেখায়। সে সময় বেশ কয়েকটি সুন্দর তারামণ্ডল দেখতে পাবে।

বর্ষার আকাশে যে তারামণ্ডলটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হলো বৃশ্চিকরাশি বা স্কর্পিয়াস (Scorpius)। এটি রাশিচক্রের তারামণ্ডলগুলির একটি। একে দেখতে পাবে দক্ষিণ আকাশে



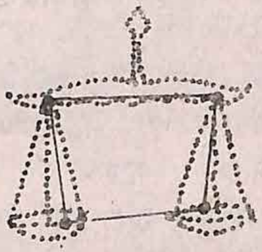
ছবি—11 বৃশ্চিক রাশি

বিশাল এক বিছের মত। নামের সঙ্গে তারামণ্ডলের আকৃতির এত সাদৃশ্য অন্য কোনও তারামণ্ডলে দেখা যায় না।

বৃশ্চিক রাশিতে একটিই প্রথম প্রভার তারা রয়েছে, নাম জ্যেষ্ঠা। উজ্জ্বল লালচে হলদে রং-এর এ তারাটির বিদেশী নাম অ্যান্টারেস্ (Antares), প্রভা 0·98। জ্যেষ্ঠাকে আকাশে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। যদি সহজে খুঁজে না পাও তবে হারকিউলিস্ তারামণ্ডলকে মাথার ওপরে রেখে (জুনের তৃতীয় সপ্তাহে রাত 10টা নাগাদ) দক্ষিণ দিগন্তের খানিকটা ওপরে দেখ তাহলেই একে খুঁজে পাবে। আবার মঘা এবং চিত্রাকে যোগ করে সেই সরল রেখাটিকে যদি দক্ষিণ পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেও জ্যেষ্ঠাকে খুঁজে পাবে।

আয়তনে জ্যেষ্ঠা বিশাল। এর ব্যাস 56 কোটি 30 লক্ষ কিলোমিটার, আমাদের সূর্যের ব্যাসের প্রায় 40 গুণ। পৃথিবী থেকে জ্যেষ্ঠার দূরত্ব 520 আলোকবর্ষ। জ্যেষ্ঠাও চান্দ্র নক্ষত্রগুলির একটি। এটি মধ্যগমন করে 1লা জুলাই রাত 10টা নাগাদ এবং 1লা এপ্রিল ভোর 4টে নাগাদ।

একবার যদি জ্যেষ্ঠাকে ভাল করে চিনে নাও তাহলে তারামণ্ডলের বাকি তারাগুলিকেও সহজেই চিনে নিতে পারবে। জুলাই মাসে আকাশ যদি মেঘশূন্য থাকে তাহলে প্রায় সারা রাত ধরে দক্ষিণ আকাশে বৃশ্চিক রাশিকে দেখতে পাবে।



ছবি—12 তুলা রাশি

কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির ঠিক মাঝখানে রয়েছে তুলারাশি, যার বিদেশী নাম লাইব্রা (Libra)। তারামণ্ডলটি খুবই ছোট এবং এতে তৃতীয় প্রভার চেয়ে উজ্জ্বল কোনও তারা নেই। সহজে যদি

খুঁজে না পাও তবে বৃশ্চিকের 'দাঁড়া'র উত্তর পশ্চিমে একটু লক্ষ করে দেখ, চারটি তারার চতুর্ভুজটি হয়ত চোখে পড়বে। তারামণ্ডলটিতে একটি দাড়ি পাল্লার আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তুলা'র ৫-তারাটি একটি চান্দ্র নক্ষত্র, নাম বিশাখা। তুলারাশি মধ্যগমন করে 1লা জুন রাত 10টায় এবং 1লা মার্চ ভোর 4টে নাগাদ।

জুলাই-আগস্ট মাসে বুওটিস তারামণ্ডলকে দেখা যায় প্রায় মাথার ওপরেই। এ সময় তারামণ্ডলটির ঠিক পূবদিকে দেখতে পাবে সাতটি তারা নিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকার ছোট একটি তারামণ্ডলকে, নাম কিরীটমণ্ডল বা করোনা বোরিয়েলিস্ (Corona Borealis)। তারামণ্ডলটি ছোট কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। এর সর্বোজ্জ্বল তারাটি দ্বিতীয় প্রভার। কিরীট মণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা জুলাই রাত 9টায় এবং 1লা এপ্রিল ভোর 3টে নাগাদ।

সর্পমণ্ডল তারামণ্ডলটি রয়েছে দু'টি ভাগে। এর অর্দ্ধেকটাকে দেখা যায় ওফিউকাস্ তারামণ্ডলের পূব দিকে। সেটা হলো সাপের লেজের দিকটা। বাকি অর্দ্ধেকটাকে দেখতে পাবে কিরীটমণ্ডলের দক্ষিণে, ওফিউকাস্ মণ্ডলের পশ্চিমে। তারামণ্ডলের এই অংশে তিনটে ছোট তারার যে ত্রিভুজটি দেখা যায় সেটাই হলো সর্পমণ্ডলের সাপের মাথা। তারামণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল তারাটিকেও দেখতে পাবে এই অংশে। এটি তৃতীয় প্রভার তারা।

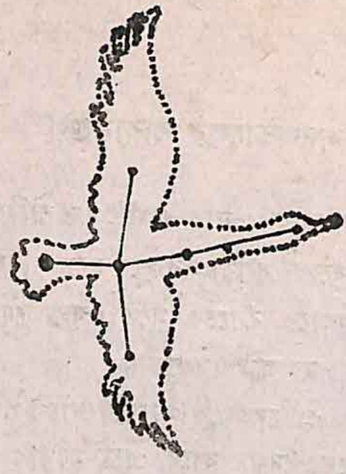
শরৎকালের তারামণ্ডল

শরতের আকাশে তারা চেনার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বর্ষার পর বায়ুমণ্ডলের যত ধুলো-ধোঁয়া সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে আকাশ একেবারে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখায় আর তাতে তারাগুলিকেও আরো জলজ্বলে দেখায়।

শরতের আকাশে প্রথমেই তোমাদের চোখে পড়বে তিনটি খুবই উজ্জ্বল তারা। তাদের দেখা যাবে প্রায় মাথার ওপরেই। মনে হবে যেন তারা তিনটি এক বিশাল ত্রিভুজের তিনটি কোণে রয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রেখ। শরৎকালে সপ্তর্ষি বা ক্যাসিওপিয়া কোনটিই উত্তর আকাশে ভালভাবে দেখা যায় না। এসময় সপ্তর্ষিকে অস্ত যেতে আর ক্যাসিওপিয়াকে উদয় হতে দেখা যায়। যাইহোক ধ্রুবতারাকে এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে চিনে নিয়েছ। সুতরাং উত্তর দিক কোন্‌টা সেটা খুঁজে নিতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। এবারে উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে দেখলেই চোখে পড়বে উজ্জ্বল তারা দিয়ে তৈরী ত্রিভুজটি।

তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি হলো অভিজিৎ (Vega)। এর প্রভা 0.04। এটি রয়েছে বীণামণ্ডল বা Lyra তারামণ্ডলে। বীণামণ্ডলটি দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু চেনা সহজ। তারামণ্ডলটিকে দেখে মনে হয় যেন একটা ত্রিভুজের সঙ্গে একটা চতুর্ভুজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই তোমরা এটিকে চিনে নিতে পারবে। বীণামণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা আগষ্ট রাত 10টায় এবং 1লা মে ভোর 4টের সময়।

অভিজিতের পূর্বদিকে যে উজ্জ্বল তারাটিকে দেখবে সেটি দেনেব (Deneb), প্রভা 1.26। এটি রয়েছে হংসমণ্ডল বা Cygnus



ছবি—13 হংসমণ্ডল

তারামণ্ডলে। হংসমণ্ডল হলো আকাশের সুন্দর তারামণ্ডলগুলির একটি। এতে আছে 6টি তারা, যাদের দেখে মনে হয় সত্যিই যেন একটা উড়ন্ত হাঁসের মূর্তি। অবশ্য তারামণ্ডলটির আকার অনেকটা একটা 'ক্রশ'-এর মতো বলে এটিকে অনেকে 'উত্তরের ক্রশ' বা Northern Crossও বলেন। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তা হলে হংসমণ্ডলে ছায়াপথের কিছুটা অংশও তোমাদের চোখে পড়বে হংসমণ্ডলের মধ্য গমনের সময় হলো 1লা সেপ্টেম্বর রাত 10টায় এবং 1লা জুলাই ভোর 4টে।

ত্রিভুজের তৃতীয় উজ্জ্বল তারাটিকে দেখা যায় অভিজিৎ ও দেনেবের দক্ষিণে। এটির নাম শ্রবণা (Altair), প্রভা, 0·80। এটি রয়েছে শ্যেনমণ্ডল বা Aquila তারামণ্ডলে। শ্রবণাকে চিনে নেওয়া খুবই সোজা, কারণ এর দু'পাশে দুটি ছোট তারা আছে। তারামণ্ডলটিতে একটা উড়ন্ত বাজপাখীর আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। শ্রবণা হলো রাশিচক্রের 27টি নক্ষত্রের একটি, যদিও এটি রাশিচক্রে নেই। এই শ্রবণা নক্ষত্রের নামানুসারেই শ্রাবণ মাসের নাম রাখা হয়েছে।

শ্যেনমণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা আগস্ট রাত 11টায় এবং 15ই মে ভোর 4টের সময়।

এবারে অভিজিতের ঠিক দক্ষিণ বরাবর যদি দৃষ্টি চালিয়ে যাও তবে দক্ষিণ দিগন্তের কিছুটা ওপরেই একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডলকে দেখতে পাবে। ওটাই হলো ধনুরাশি। রাশিচক্রের এই তারামণ্ডল-টিতে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা আছে বলে সহজেই এটিকে চিনে নেওয়া যায়। বলা হয় যে তারামণ্ডলটিতে তীরধনুক হাতে আধা-



ছবি—14 ধনুরাশিতে তীর ধনুক হাতে আধা-মানুষ আধা-ঘোড়ার আকৃতি

মানুষ আধা-ঘোড়ার আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু চোখে তোমাদের প্রথমেই চোখে পড়বে 'চায়ের পট'-এর মতো একটা আকৃতি যেটা তোমরা সহজেই চিনে নিতে পারবে। চায়ের পট-এর হাতলটা থাকবে বাঁ দিকে আর মুখটা ডানদিকে।

ধনুরাশিতে দুটি চান্দ্র নক্ষত্রও আছে। তাদের নাম পূর্ব আষাঢ়া ও উত্তর আষাঢ়া। পূর্ব আষাঢ়া নক্ষত্রটির প্রভা 1·9। উত্তর আষাঢ়া নক্ষত্রটির প্রভা 2·1। এ দুটি নক্ষত্রের নামেই আষাঢ় মাসের নাম রাখা হয়েছে।

ধনুরাশির পশ্চিম প্রান্তের কাছেই ছায়াপথের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশটা রয়েছে। সেজন্যে তারামণ্ডলটিতে বেশ কয়েকটি সুন্দর তারা-পুঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, খালি চোখেই

তাদের দু'একটাকে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। ধনুরাশি মধ্যগমন করে 1লা আগস্ট রাত 10টায় এবং 1লা মে ভোর 4টের সময়।

ধনুরাশির পূর্ব দিকে, একটু ওপরে রয়েছে রাশিচক্রের আর একটি রাশি, নাম মকর রাশি। এটিকে চট্ করে খুঁজে বের করতে তোমরা হয়তো নাও পারো, কারণ এতে কোনও উজ্জ্বল তারা নেই। কিন্তু এটিকে খুঁজে বের করার একটা সহজ উপায় আছে। ধরো, অভিজিৎ আর শ্রবণাকে একটা রেখা দিয়ে যুক্ত করলে। এখন এই রেখাটিকে যদি ঠিক অতটাই দক্ষিণ দিকে বাড়িয়ে দাও তা হলেই খুঁজে পাবে মকর রাশিকে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তা হলে হয়তো তারামণ্ডলটির সব কটি তারাই তোমাদের চোখে পড়বে। মনে হবে ঠিক যেন একটা উল্টো করে রাখা বাঁশের টোকা। অনেকের কাছে আবার আকৃতিটাকে একটা নৌকো বলেও মনে হতে পারে। যাই হোক, যদি তোমরা তারামণ্ডলটিতে মকর নামক বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তুটিকে খুঁজে না পাও তবে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই।

মকর রাশির পশ্চিম প্রান্তের উত্তর দিকে যে তারাটিকে দেখা যায় সেটি আসলে একটি যুগল তারা বা double star। শুধু চোখেই তোমরা দুটিকে হয়তো আলাদাভাবে দেখতে পাবে, তবে তার জন্যে একটু চেষ্টা করতে হবে। রাশিচক্রে থাকা সত্ত্বেও মকর রাশিতে কোনও উজ্জ্বল তারা নেই বলে এর কোনও তারাকেই নক্ষত্র বলে গণ্য করা হয় না। মকর রাশি মধ্যগমন করে 1লা সেপ্টেম্বর রাত 10 টায় এবং 1লা জুন ভোর 4টের সময়।

ধনু ও মকরের পর আবার উত্তর আকাশে ফিরে আসা যাক্। এখানে বীণামণ্ডলের ঠিক পশ্চিমে দেখতে পাবে হারকিউলিস্ (Hercules) তারামণ্ডলটিকে। বলা হয় এই তারামণ্ডলটিতে প্রায় 140টি তারা আছে যেগুলি শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে কিন্তু তাদের বেশির ভাগই খুবই ক্ষীণ, তাদের প্রভা 3 এর বেশি। মাত্র তিনটি তারা আছে যাদের প্রভা 3-এর চেয়ে কম।

যাই হোক, আকাশে হারকিউলিস্‌কে চিনে নিতে খুব একটা

অসুবিধে হয় না। তারামণ্ডলটিকে চেনবার সব চেয়ে সহজ উপায় হলো এতে ইংরেজি অক্ষর **H**এর আকৃতিটাকে খুঁজে বের করা। তারপর বাকি তারামণ্ডলটির আকার সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

সব মিলে হারকিউলিস্ তারামণ্ডলটিকে দেখতে ঠিক যেন হাঁটু গেড়ে বসা এক হাতকাটা একটি মানুষের আকৃতির মতো। মধ্য-গমনের সময় তারামণ্ডলটিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে। যদি সে সময় উত্তরমুখো হয়ে তারামণ্ডলটিকে দেখ, তবে সহজেই সেই এক হাতওয়ালা মানুষটিকে চিনে নিতে পারবে।

হারকিউলিস্ মধ্যগমন করে 1লা জুলাই রাত 10টায় এবং 1লা এপ্রিল ভোর 4টের সময়। হারকিউলিসের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে ওফিউকাস্ (**Ophiuchus**) তারামণ্ডল। ওফিউকাস্ মানে হলো 'সর্পধারী'। তারামণ্ডলটিতে কল্পনা করা হয়েছে সাপ হাতে ধরা এক মানুষের আকৃতি। অবশ্য এখানে সাপটা দেখানো হয় একটা আলাদা তারামণ্ডলে যার নাম সর্পমণ্ডল বা Serpens তারামণ্ডল। ওফিউকাসে্ কেবলমাত্র মানুষটির আকৃতি কল্পনা করা হয়।

ওফিউকাস্কে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো হারকিউলিসের দক্ষিণে বিশাল পঞ্চভূজের আকারটিকে খুঁজে বের করা। তারামণ্ডলটি খুবই বিশাল বলে প্রথমে পঞ্চভূজের পাঁচটি তারাকে খুঁজতে হয়তো একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পেয়ে যাবে।

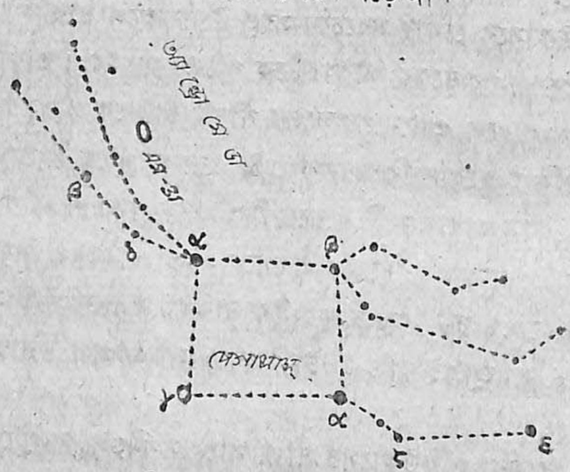
ওফিউকাস্ তারামণ্ডলটি রয়েছে ঠিক মধ্য আকাশে। খ-বিষুব-রেখা ঠিক এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তা ছাড়া খ-বিষুববৃত্তের ওপর এটি রয়েছে দুটি বিষুববিন্দুর ঠিক মাঝখানে। ওফিউকাস্ মধ্য-গমন করে 1লা জুলাই রাত 10টায় এবং 1লা এপ্রিল ভোর 4টের সময়।

যদি তোমরা ওফিউকাসের সাপ, মানে সর্পমণ্ডলকে খুঁজে বের করতে চাও তা হলে ওফিউকাস ও ধনুরাশির ঠিক মাঝখানে তার অর্ধেকটা অংশ দেখতে পারো। এটা হলো সাপের লেজের দিকটা। সাপের বাকি অর্ধেকটা, মানে মাথার দিকটাকে দেখা যায় ওফিউ-কাসের পশ্চিমে।

হেমন্তের আকাশ

হেমন্তের উত্তর আকাশে যে তারামণ্ডলটিকে সহজেই চেনা যায় সেটি হলো ক্যাসিওপিয়া (Cassiopia)। এর বিষয় আগেই বলেছি। অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাবে উত্তর পূর্ব আকাশে দিগন্তের বেশ ওপরে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাসিওপিয়া মধ্যগমন করে রাত 9টা নাগাদ। সে সময় উত্তর আকাশে একে দেখায় ইংরেজী 'M'-এর মত।

ক্যাসিওপিয়ার ঠিক দক্ষিণে একসঙ্গে দুটি তারামণ্ডলকে দেখা যায়। একটি পেগাসাস্ (Pegasus), অন্যটি অ্যান্ড্রোমেডা (Andromeda)। পেগাসাস্ একটি বিশাল তারামণ্ডল। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে পেগাসাস্ হলো পক্ষিরাজ ঘোড়া, কিন্তু তারামণ্ডলটিতে সেরকম কোন আকৃতি চোখে পড়ে না।



ছবি—15 পেগাসাস্ ও অ্যাণ্ড্রোমেডা

পেগাসাস্‌কে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো প্রথমেই এর বিশাল বর্গাকারক্ষেত্রটিকে খুঁজে নেওয়া। চারটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে

তৈরী বর্গক্ষেত্রটির ভেতরের অংশটা একেবারে ফাঁকা। সুতরাং চিনতে অসুবিধে হয় না। পেগাসাস্ মধ্যগমন করে 1লা অক্টোবর রাত 11টায় এবং 1লা জুলাই ভোর 4টের সময়। ঐ সময় তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাবে আকাশে ঠিক মাথার ওপরে।

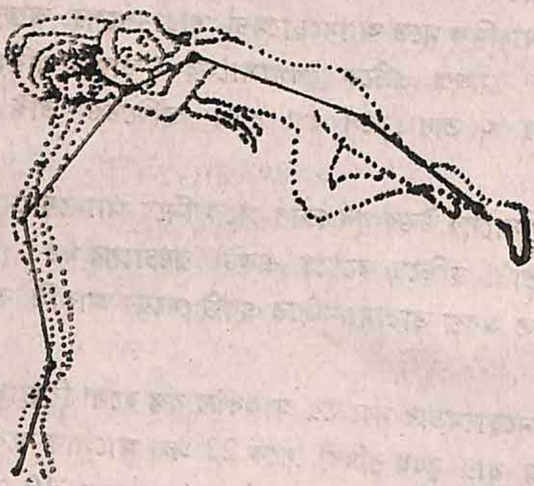
পেগাসাসে চান্দ্র তিথি সংক্রান্ত দুটি নক্ষত্র রয়েছে। প্রথমটি তারামণ্ডলের α ও β তারা দুটি নিয়ে তৈরী নক্ষত্র পূর্বভাদ্রপদা। অন্যটি পেগাসাসের γ ও পাশের অ্যানড্রোমেডার ক তারা নিয়ে তৈরী, নাম উত্তর ভাদ্রপদা।

পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের উত্তর পূর্ব কোণে যে উজ্জ্বল তারাটি রয়েছে সেটিকে আধুনিক মতে অ্যানড্রোমেডা তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। সেজন্য এটিকে পেগাসাসের β তারার পরিবর্তে অ্যানড্রোমেডার α তারা বলে ধরা হয়। ছবিতেও তাই দেখানো হয়েছে।

পেগাসাসের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে নিয়ে অ্যানড্রোমেডার চারটি উজ্জ্বল তারা ছড়িয়ে রয়েছে একটা বৃত্তচাপের মত। পৌরাণিক কাহিনীতে অবশ্য তারামণ্ডলটিতে একটি মেয়ের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে।

অ্যানড্রোমেডার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হলো বিখ্যাত 'এম-31' গ্যালাক্সি যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে 22 লক্ষ আলোক বর্ষেরও বেশী। যদি মনে রাখো যে এক আলোক বর্ষ মানে প্রায় 10 লক্ষ কোটি (10-এর পর 12টা শূন্য) কিলোমিটার তাহলে এম 31-এর দূরত্বের একটা আন্দাজ পাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হলো এই যে অত দূরে থাকা সত্ত্বেও একে তোমরা শুধু চোখে দেখতে পাবে। অবশ্য মনে রেখ এম-31 থেকে আজ যে আলো তোমাদের চোখে পৌঁছচ্ছে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 22 লক্ষ বছর আগে। মানে আজ এম-31-এর যে রূপ আমাদের চোখে পড়ছে তা আসলে এর 22 লক্ষ বছর আগেকার রূপ। ঠিক এই মুহূর্তে এম-31কে দেখতে কেমন তা আমরা জানতে পারবো আজ থেকে 22 লক্ষ বছর পরে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে শুধু চোখে এম-31কে দেখায় খুব অস্পষ্ট লম্বাটে আলোর ছোপের মত। অবশ্য একে খুঁজে বের করতে একটু চেষ্টা করতে হবে। অ্যানড্রোমেডার β-তারাটির একটু ওপরেই একে দেখতে পাবে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। এম-31-এর আসল রূপ ধরা পড়ে শক্তিশালী দূরবীনে বহুক্ষণ ধরে তোলা ছবিতে। দেখা যায় একটি আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতই পৃথক একটি গ্যালাক্সি। আমাদের ছায়াপথের মত এতেও রয়েছে কোটি কোটি তারার সমাবেশ। এম-31 মধ্যগমন করে 1লা নভেম্বর রাত 10টায় এবং 1লা আগস্ট ভোর 4টের সময়।



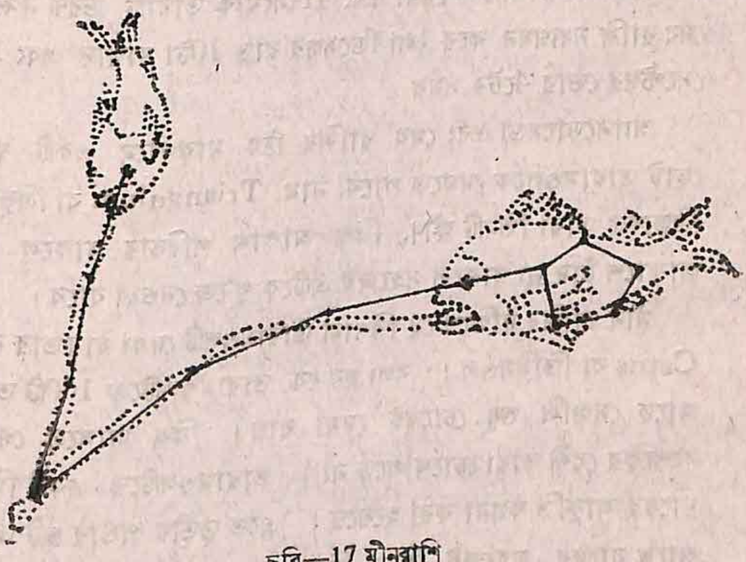
ছবি—16 কুম্ভরাশি

পেগাসাসের দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের কুম্ভ বা **Aquarius** তারামণ্ডল। তারামণ্ডলটি বিস্তীর্ণ, কিন্তু এর তারাগুলির কোনওটিই খুব একটা উজ্জ্বল নয়। সেজন্য একে চিনতে একটু অসুবিধে হতে পারে। ক্রান্তিবৃত্তের ওপর কুম্ভ রাশি রয়েছে মকর রাশির উত্তর পূবে। এটিকে চেনবার সহজ উপায় হলো পেগাসাসের α-তারাটির দক্ষিণ পশ্চিমে চারটি ছোট তারাকে প্রথমে খুঁজে বের করা। তারাগুলি খুবই ক্ষীণ, হয়তো চট্ করে চোখে নাও পড়তে

পারে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই চিনে নিতে পারবে। দেখবে চারটি তারা মিলে ইংরেজী অক্ষর 'Y' তৈরী হয়েছে। ঐটেই কুম্ভ রাশির 'কুম্ভ'। তারামণ্ডলটিতে আর কোনও বিশেষ দেখবার জিনিষ নেই। তবে এর λ-তারাটি হলো চান্দ্র নক্ষত্রের একটি, নাম শতভিষা। কুম্ভ রাশি মধ্যগমন করে 1 লা অক্টোবর রাত 10 টায় এবং 1 জুলাই ভোর 4টের সময়।

কুম্ভরাশির দক্ষিণে যে উজ্জ্বল তারাটিকে দেখা যায় তার নাম ফোমালো (Fomalhaut)। যে তারামণ্ডলে তারাটি রয়েছে তার নাম পিসিস্ অস্ট্র্যালিস্ (Piscis Australis) বা দক্ষিণের মৎস্য। তারামণ্ডলটি খুবই ছোট, ফোমালো ছাড়া এতে আর কোনও উজ্জ্বল তারা নেই। ফোমালো মধ্যগমন করে 1লা অক্টোবর রাত 10টায় এবং 1লা জুলাই ভোর 4টের সময়।

রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি মীন (Pisces) রয়েছে পেগাসাসের



ছবি—17 মীনরাশি

বর্গক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, বিশাল এক 'V' এর আকারে। এ তারামণ্ডলটিতেও কোনও উজ্জ্বল তারা নেই বলে একে সহজে খুঁজে

বের করা সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করলে পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের ঠিক দক্ষিণে পাঁচটি তারার পঞ্চভূজ হয়ত চোখে পড়বে। ঐটেই হলো মীন রাশির ছুটি মৎস্যের একটি। সম্পূর্ণ তারামণ্ডলটিকে দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'V' এর মত। অবশ্য এর তারাগুলি এতই ক্ষীণ যে হয়ত চট্ করে চোখে পড়বে না। তবুও, আকাশ পরিষ্কার থাকলে চেষ্টা করো, নিশ্চই খুঁজে পাবে। মীন রাশির δ-তারাটি হলো চান্দ্র নক্ষত্র রেবতী। তারাটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি রয়েছে ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক ওপরে।

মীন রাশির মধ্যগমনের সময় 1লা নভেম্বর রাত 10টা এবং 1লা আগস্ট ভোর 4টে।

রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ (Aries) কে দেখতে পাবে মীন রাশির ঠিক পূবে। তারামণ্ডলটিতে ছুটি উজ্জ্বল তারা আছে যাদের সহজেই চিনে নিতে পারবে। তারামণ্ডলটিতে ছুটি চান্দ্র নক্ষত্রও রয়েছে। β-তারাটি অশ্বিনী এবং 41-সংখ্যক তারাটি ভরণী নক্ষত্র। মেষ রাশি মধ্যগমন করে 1লা ডিসেম্বর রাত 10টা নাগাদ এবং 1লা সেপ্টেম্বর ভোর 4টের সময়।

অ্যানড্রোমেডা এবং মেষ রাশির ঠিক মাঝখানে একটি খুবই ছোট তারামণ্ডলকে দেখতে পাবে, নাম Triangulum বা ত্রিভুজ। ত্রিভুজের তারা তিনটি ক্ষীণ, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং আকাশে চাঁদ না থাকলে সহজেই এটিকে খুঁজে নেওয়া যাবে।

মীন রাশির দক্ষিণে যে বিশাল তারামণ্ডলটি দেখা যায়তার নাম Cetus বা তিমিমণ্ডল। বলা হয় যে তারামণ্ডলটিতে 100টি তারা আছে সেগুলি শুধু চোখেই দেখা যায়। কিন্তু আসলে গোটা দশেকের বেশী তারা চোখে পড়ে না। তারামণ্ডলটিতে একটি তিমি মাছের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। এতে তৃতীয় প্রভার ছুটি তারা আছে যাদের সহজেই চিনে নিতে পারবে। বাকি কয়েকটি তারাকেও এবারে চিনে নিতে অসুবিধা হবে না।

তিমিমণ্ডলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তারাটি হলো লালচে, হলদে

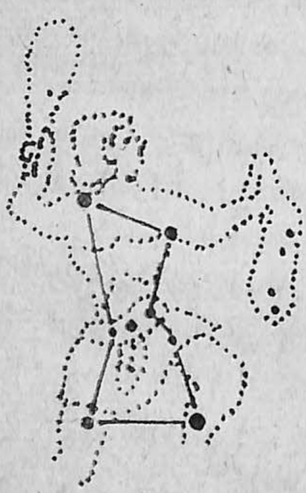
রং এর তারা 'মাইরা' (Mira)। তারাটির ঔজ্জ্বল্য এক থাকে না, বাড়ে কমে। যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল মাইরার প্রভা হয়ে দাঁড়ায় 1·7। সে সময় শুধু চোখে তাকে দেখায় বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই মাইরার ঔজ্জ্বল্য কমে হয়ে দাঁড়ায় 10, তখন শুধু চোখে ত নয়ই, ছোট দূরবিনেও তাকে দেখা যায় না। দেখা গেছে যে তারাটির ঔজ্জ্বল্যের কম বেশী হতে সময় লাগে প্রায় 11 মাস (331 দিন), যার মধ্যে মাত্র 6 মাস তাকে শুধু চোখে দেখা যায়। সুতরাং প্রথমেই যদি মাইরাকে খুঁজে না পাও হতাস হবার কিছু নেই। কয়েক মাস পরে হয়ত তাকে খুঁজে পেতে পারো। মাইরা মধ্যগমন করে নভেম্বরের শেষের দিকে রাত 10টা নাগাদ এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভোর 4টে নাগাদ।

যদি তোমরা পুরী বা তারও দক্ষিণে যাও তবে সেখান থেকে কোমালো তারাটির দক্ষিণে দুটি উজ্জ্বল তারা তোমাদের চোখে পড়বে দক্ষিণ দিগন্তের ঠিক ওপরেই। তারা দুটি Grus বা বক্‌মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি তারাকে অবশ্য কলকাতা বা আরও উত্তর থেকে দেখতে পাবে না।

শীতের আকাশ

শীতের মেঘহীন আকাশে যে তারামণ্ডলটি সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার নাম কালপুরুষ বা ওরায়ন (Orion)। বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী তারামণ্ডলটিতে যোদ্ধার বেশে একটি মানুষের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। মানুষটির এক হাতে আছে ঢাল, অপর হাতে মুগুর। তার কটিবন্ধে ঝুলছে খাপে ঢাকা তরওয়াল।

কালপুরুষ তারামণ্ডলের সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল তারাটির নাম বাণরাজা বা রাইজেল (Rigel)। নীলচে আভার সাদা রং এর এই তারাটি রয়েছে কালপুরুষের বাঁ পায়ে। তারা হিসেবে বাণরাজার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারাটির ব্যাস সূর্যের প্রায় 33 গুণ আর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের তুলনায় প্রায় 55,000 গুণ। পৃথিবী থেকে বাণরাজার দূরত্ব প্রায় 1200 আলোক বর্ষ।

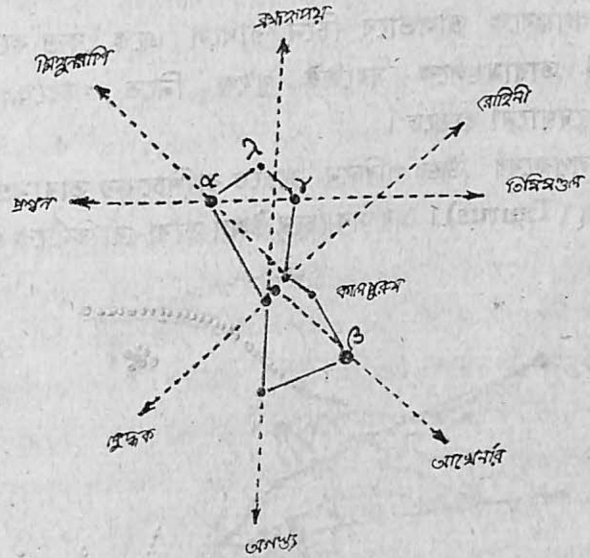


ছবি—18 কালপুরুষ

কালপুরুষ তারামণ্ডলের আর একটি উজ্জ্বল তারা আর্দ্রা বা বিটেল্‌জ্যুস্ (Betelgeuse)। এটিকে দেখতে পাবে কালপুরুষের ডান কাঁধে। লালচে হলদে রং এর তারাটি বিশাল। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় 450 গুণ, কিন্তু এ ব্যাস সব সময় এক থাকে না, যথেষ্ট কমে বাড়ে। সেজন্য আর্দ্রার ঔজ্জ্বল্যেও যথেষ্ঠ কম বেশী হয়। যখন সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল সে সময় আর্দ্রার প্রভা 0·3, কিন্তু সময় সময় এর প্রভা

কমে দাঁড়ায় 1 1। পৃথিবী থেকে আর্দ্রার দূরত্ব 520 আলোক বর্ষ। কালপুরুষের বাঁ কাঁধের তারাটির নাম বেলাট্রিক্স্ (**Bellatrix**)।

কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি তারাকে দেখা যায় একই সরলরেখায়। এদের মধ্যে 'δ' তারাটি রয়েছে খ-বিষুবের ঠিক ওপরে। তাই আকাশে এটির চলন ঠিক পূব থেকে পশ্চিমে। এটি উদয় হয় ঠিক পূবে, অস্ত যায় ঠিক পশ্চিমে। এখানে একটা কথা



ছবি—**19** কালপুরুষের আশে পাশে তারামণ্ডল

বলে রাখি। কালপুরুষ যখন সবে উদয় হচ্ছে (নভেম্বরের শুরুতে রাত 9টা নাগাত) তখন তাকে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঐ তিনটি তারাকে চিনে নেওয়া।

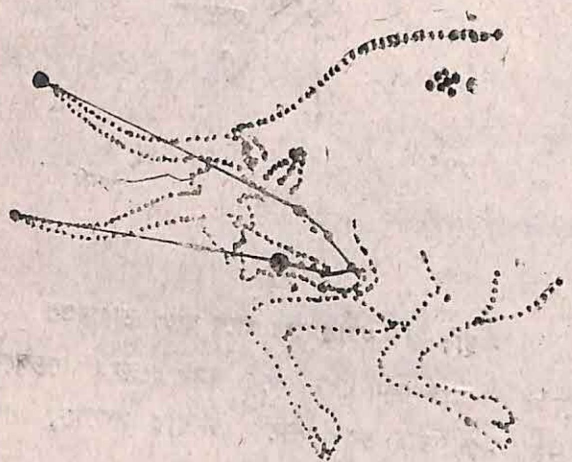
কালপুরুষের কটিবন্ধের নীচে, যেখানে খাপে ঢাকা তরওয়ালের কল্পনা করা হয়েছে, সেখানে দেখতে পাবে অস্পষ্ট আলোর একটা ছোপ। ওটা আসলে একটি নীহারিকা নাম ওরায়ন নেবুলা (Orion nebula) বা 'এম-42'। দূরবীনে নীহারিকাটির হালকা সবুজ রং-এর গ্যাসীয় রূপ চোখে পড়ে। মহাকাশে এম-42 এর মত গ্যাসীয় পিণ্ডের ভেতরেই তারাদের জন্ম হয়।

কালপুরুষে দুটি চান্দ্র নক্ষত্র আছে। তারামণ্ডলের 'λ'-তারাটি (যেটি কালপুরুষের মাথা) হলো মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। অন্যটি আর্দ্রা যার বিষয় আগে বলেছি।

কালপুরুষ মধ্যগমন করে 1লা জানুয়ারি রাত 11টায় এবং 1লা অক্টোবর ভোর 5টা নাগাদ। পৌষ মাঘ মাসে তারা মণ্ডলটিকে প্রায় সারা রাত ধরেই আকাশে দেখতে পাবে।

কালপুরুষকে ভালভাবে চিনে রাখলে একে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি তারামণ্ডলকে সহজেই খুঁজে নিতে পারবে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে।

কালপুরুষের উত্তর পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের তারামণ্ডল বৃষ বা টরাস্ (**Taurus**)। এর সব চেয়ে উজ্জ্বল তারা রোহিনীকে দেখতে



ছবি—20 বৃষরাশি

পাবে কালপুরুষের বাঁ হাতে ধরা ঢালের ঠিক ওপরে। রোহিণীর বিদেশী নাম অ্যালডেবারান্ (Aldebaran)। রেহিণীকে দেখতে প্রায় আর্দ্রার মতই, লালচে হলদে রং এর, তবে এর ঔজ্জ্বল্য আর্দ্রার তুলনায় কম। রোহিণী ছাড়া বৃষরাশিতে আর একটি উজ্জ্বল তারা আছে নাম 'এল্-নাথ' (El-Nath)।

বৃষরাশির সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিষ দুটি তারাপুঞ্জ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রোহিণীর আশেপাশে গোটাদশেক ছোট ছোট তারা চোখে পড়বে। তারাপুঞ্জটির বিদেশী নাম হায়াডিজ্ (Hyaldes)। ভারতীয় মতে এটিকে রোহিণী চান্দ্র নক্ষত্রের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরা হয়। রোহিনীকে নিয়ে হায়াডিজ তারাপুঞ্জটিকে দেখায় অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'V' এর মত।

এখানে একটা কথা মনে রেখ। পৃথিবী থেকে রোহিণীকে হায়াডিজ তারাপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবী থেকে হায়াডিজ-এর দূরত্ব প্রায় 130 আলোক বর্ষ। সে তুলনায় রোহিণীর দূরত্ব মাত্র 68 আলোক বর্ষ। মহাকাশে একই দৃষ্টি পথে রয়েছে বলেই অমন মনে হয়।

বৃষরাশির দ্বিতীয় তারাপুঞ্জটিকে দেখতে আরও সুন্দর নাম কৃত্তিকা বা প্লিয়াডিজ (Pleiades)। একে দেখতে পাবে মেষ-রাশির ঠিক পূবে। কৃত্তিকা পুঞ্জের সাতটি তারাকে অনায়াসে শুধু চোখে দেখা যায়। সে জন্য একে 'সাত ভাই চম্পা'ও বলা হয়। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে দশটি তারা চোখে পড়তে পারে, তার বেশী নয়। দূরবীনে অবশ্য একশ রও বেশী তারা দেখা যায়। তারাপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির নাম এ্যালসাইওন (Alcy-one)। পৃথিবী থেকে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের দূরত্ব প্রায় 500 আলোক বর্ষ। রোহিণী ও কৃত্তিকা দুইই চান্দ্র-নক্ষত্র।

কৃত্তিকা মধ্যগমন করে 1লা জানুয়ারি রাত 9টায় এবং 1লা নভেম্বর ভোর 3টে নাগাদ। রোহিণী মধ্যগমন করে 1লা ফেব্রুয়ারি রাত 8টায় এবং 1লা অক্টোবর ভোর 4টে নাগাদ।

বৃষরাশির ঠিক উত্তরে রয়েছে প্রজাপতি বা অরাইগা (Auriga) তারামণ্ডল। এতে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা রয়েছে বলে সহজেই চেনা যায়। পাঁচটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী এর বিশাল পঞ্চভুজটিকে দেখতে পাবে বৃষের ঠিক মাথার ওপর। পঞ্চভুজের দক্ষিণ প্রান্তের তারাটি অবশ্য বৃষরাশিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রজাপতি তারামণ্ডলের সবচেয়ে

উজ্জ্বল তারাটির নাম ব্রহ্মহৃদয় বা ক্যাপেলা (Capella)। হালকা হলদে রং-এর তারাটির প্রভা 0·2। ব্রহ্মহৃদয় মধ্যগমন করে 20শে জানুয়ারি রাত 9টা নাগাদ এবং 20শে অক্টোবর ভোর 3টে নাগাদ।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে ব্রহ্মহৃদয়ের ঠিক দক্ষিণে ত্রিভুজের আকারে তিনটি ছোট তারা দেখতে পাবে। এদের মধ্যে ϵ-তারাটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। চতুর্থ প্রভার এই তারাটি আসলে একটি যুগল তারা কিন্তু এর সঙ্গী তারাটিকে দেখা যায় না কারণ সেটি আলো বিকীরণ করে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারাটি থেকে বেরিয়ে আসা অবলোহিত রশ্মি বা infrared rays অধ্যয়ন করেই এর বিষয় জানতে পেরেছেন। তাঁদের মতে অদৃশ্য ঐ তারাটি সম্ভবতঃ মহাকাশের সবচেয়ে বড় তারা। তার ব্যাস প্রায় 300 কোটি কিলোমিটার, মানে আমাদের সূর্যের ব্যাসের 2100 গুণ! অতিকায় ঐ অদৃশ্য তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে 3400 আলোক বর্ষ দূরে।

উত্তর আকাশে প্রজাপতি ও অ্যানড্রোমেডার মাঝখানে রয়েছে পারসিউস্ (Perseus) তারামণ্ডল। এ তারামণ্ডলটিতে মাত্র একটি উজ্জ্বল (দ্বিতীয় প্রভার) তারা আছে (ছবিতে α-তারা), বাকি সবই তৃতীয় বা চতুর্থ প্রভার তারা। α-তারাটিকে খুঁজে পেতে হলে অ্যানড্রেমেডার β-ও γ-তারা দুটিকে যোগ করে সেই রেখাটিকে পূবদিকে বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই হবে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলে ব্রহ্মহৃদয়ের পশ্চিমে এ তারাটিকে চিনতে খুব অসুবিধে হবে না।

পারসিউস্ তারামণ্ডলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অ্যাল্‌গল্ (Algol) নামক তারাটি। অ্যালগলের বৈশিষ্ট্য এর ঔজ্জ্বল্য নিয়মিত বাড়ে কমে। যদি পর পর কয়েক রাত ধরে তারাটিকে লক্ষ করো তাহলে দেখবে প্রতি আড়াই দিনে (59 ঘণ্টা বাদে) এর ঔজ্জ্বল্য কমতে শুরু করে। এর প্রভা 2·2 থেকে কমতে কমতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টায় মধ্যে

হয়ে দাঁড়ায় 3.5। তারপর পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টা ধরে আবার তা বাড়তে থাকে এবং আগেকার ঔজ্জ্বল্যে ফিরে আসে। তারপর আড়াই দিন একই থাকে। এমনটা হয় কারণ অ্যাল্গল্ আসলে একটি যুগ্ম তারা—এর সঙ্গে আরও একটি তারা আছে যার প্রভা অনেক কম। দুটো একে অপরকে পাক খেয়ে ঘুরছে বলে প্রতি 59 ঘণ্টা অন্তর কম প্রভার তারাটির পৃথিবী আর উজ্জ্বল তারাটির মাঝে এসে পড়ছে, অনেকটা যেমন হয় পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময়। এর ফলেই উজ্জ্বল তারাটি কয়েক ঘণ্টার জন্যে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

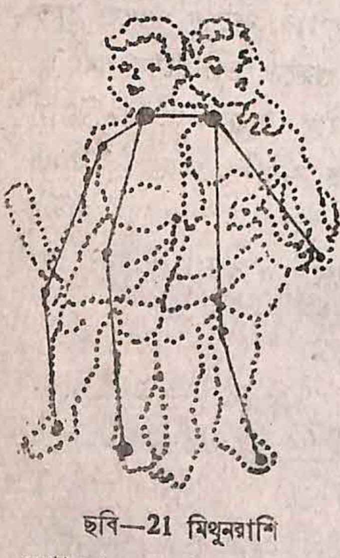
উত্তর আকাশ থেকে এবারে কালপুরুষের দক্ষিণের কয়েকটি তারামণ্ডলের দিকে নজর দেওয়া যাক্। কালপুরুষ যখন মধ্যগমন করছে, মানে যখন সে আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে, তখন দক্ষিণ দিগন্তের একটু ওপরেই খুব উজ্জ্বল একটা তারা দেখতে পাবে। ওটা হলো অগস্ত্য বা ক্যানোপাস্ (Canopus)। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় (প্রভা—0·7)। দক্ষিণ আকাশের তারা বলে অগস্ত্যকে ভারতের উত্তারাংশ থেকে দিগন্তের ওপরে খুব অল্প সময়ের জন্যেই দেখা যায়। দক্ষিণ দিগন্তের সবচেয়ে ওপরে একে দেখতে পাবে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে রাত 10টা নাগাদ, আবার নভেম্বর মাসের শুরুতে ভোর 4টের সময়।

আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারাটির নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস্ (Sirius), প্রভা--1.4। এটি রয়েছে ক্যানিস মেজর (Canis Major) তারামণ্ডলে। একে দেখতে পাবে কালপুরুষের দক্ষিণ পূবে। লুব্ধক মধ্যগমন করে 1লা ফেব্রুয়ারি রাত 10টায় এবং 1লা নভেম্বর ভোর 4টে নাগাদ।

বসন্তের আকাশ

মেষ ও বৃষের পরে রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি মিথুন রাশি বা জেমিনি (Gemini) রয়েছে কালপুরুষের উত্তর পূবে। বসন্তের আকাশে একে দেখতে পাবে প্রায় মাথার ওপরে।

মিথুন রাশিকে চিনতে হলে প্রথমেই এর ছুটি উজ্জ্বল তারাকে চিনে নিতে হবে। কালপুরুষের বাণরাজা ও আর্দ্রা তারাছুটিকে যোগ করে সেই রেখাটি যদি উত্তর পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই এদের খুঁজে পাবে। তারা ছুটির যেটি বেশী উজ্জ্বল (রাশির β তারা) সেটির নাম প্রথম পুনর্বসু বা পোলাক্স (Pollux)। প্রথম প্রভার লালচে রং-এর তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে 35 আলোকবর্ষ দূরে। প্রথম পুনর্বসুর পশ্চিমের তারাটি মিথুন রাশির α-তারা, নাম দ্বিতীয় পুনর্বসু বা ক্যাস্টর (Castor)। নীলচে সাদা রং-এর এ তারাটি দ্বিতীয় প্রভার তারা, পৃথিবী থেকে দূরত্ব 45 আলোকবর্ষ। শুধু চোখে দেখে দ্বিতীয় পুনর্বসুকে একটি তারা বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু এটি যুগ্ম তারা। ছোট দূরবীনে বা বাইনো- ক্যুলারে দ্বিতীয় তারাটি চোখে পড়ে। প্রথম পুনর্বসুকে চান্দ্র নক্ষত্র পুনর্বসু হিসেবে ধরা হয়।



ছবি—21 মিথুনরাশি

মিথুন রাশির γ-তারাটিও বেশ উজ্জ্বল এবং সহজেই চোখে পড়ে। 2·2 প্রভার তারাটিকে দেখা যায় আর্দ্রা ও প্রথম পুনর্বসুর ঠিক মাঝখানে।

মিথুনরাশির বাকি তারাগুলি যদিও খুব একটা উজ্জ্বল নয়, আকাশ পরিষ্কার থাকলে তাদেরও সহজেই খুঁজে নিতে পারবে। সব মিলিয়ে তারামণ্ডলটিতে দুটি মানুষের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। পুনর্বসু দুটি মধ্যগমন করে মার্চের মাঝামাঝি রাত 8টা নাগাদ এবং 1লা ডিসেম্বর ভোর তিনটে নাগাদ।

মিথুনরাশির দক্ষিণে কিছু দূরে যে উজ্জ্বল তারাটি চোখে পড়ে সেটির নাম প্রশ্বন্ (Procyon), প্রভা 0 4। যে তারামণ্ডলে এটি রয়েছে সেটি খুবই ছোট, নাম ছোট কুক্কুরমণ্ডল বা ক্যানিস্ মাইনর (Canis Minor)। প্রশ্বন্ ছাড়া তারামণ্ডলটিতে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। এর β-তারাটির প্রভা 3 1। পৃথিবী থেকে প্রশ্বনের দূরত্ব 11·3 আলোকবর্ষ। প্রশ্বন্ মধ্যগমন করে মার্চের শুরুতে রাত 9টা নাগাদ এবং ডিসেম্বরের শুরুতে ভোর তিনটে নাগাদ।

ছোট কুক্কুরমণ্ডলের দক্ষিণে রয়েছে বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল বা ক্যানিস্ মেজর (Canis Major)। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক রয়েছে এই তারামণ্ডলেই। লুব্ধকের বিষয় আগে কিছু বলেছি, তবে আরো কিছু বলার আছে।



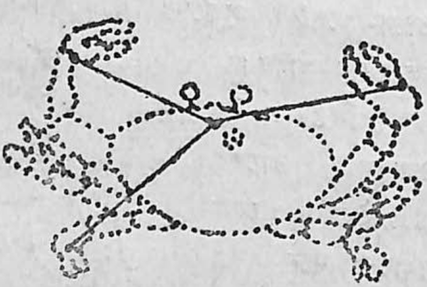
ছবি—22 বৃহৎ কুক্কুট মণ্ডল

লুব্ধকের বৈশিষ্ট্য এর অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য। রাতের আকাশে তারাটির ঔজ্জ্বল্য অনেক সময় চোখ ধাঁধানো মনে হয়। কখনও কখনও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ত তোমাদের চোখে পড়বে। লুব্ধক যখন দিগন্তের কাছাকাছি থাকে তখন মনে হয় তারাটি যেন থেকে থেকে রং বদলাচ্ছে। কখনও সে দেখায় উজ্জ্বল নীল রং-এর, কখনও লাল, আবার কখনও বা সবুজ রং-এর। ব্যাপারটা অনেকটা হীরের আংটিতে আলো পড়লে যেমন দেখায় তেমন মনে হয়। আসলে

কিন্তু সেরকম কিছু নয়। অমনটা হয় কেবলমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তনের দরুন।

লুব্ধকের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যের দরুণ একে কখনও কখনও দিনের আকাশেও দেখা সম্ভব। শুনে হয়ত তোমরা অবাক হবে, কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। দিনের আকাশে চাঁদকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তৃতীয়া বা চতুর্থীর ফালি চাঁদকেও নীল আকাশে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দিনের আকাশে লুব্ধককে দেখতে পাওয়াটাও যে অসম্ভব নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। দিনের আলোয় লুব্ধককে খুঁজে বের করতে হলে আকাশের ঠিক কোথায় দেখতে হবে সেটা অবশ্যই জানা চাই, নইলে তাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ছোট দূরবীন বা অপেরা গ্লাস হলে আরও ভাল হয়।

লুব্ধক ছাড়া বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডলের বেশ কয়েকটি তারা সহজেই চোখে পড়ে। তাদের নিয়ে তারামণ্ডলটিতে একটি কুকুরের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তোমরাও হয়ত তাকে চিনে নিতে পারবে।



ছবি—23 কর্কট রাশি

পৌরাণিক কাহিনীতে কুকুরটি কালপুরুষেরই সঙ্গী, আর সেজন্য তারই পাশে একে দেখা যায়।

রাশিচক্রে মিথুনের পরের রাশি কর্কট বা ক্যান্সার (Cancer)। তারামণ্ডলটিতে একটিও উজ্জ্বল তারা নেই বলে একে খুঁজে পাওয়া কঠিন। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রভার তারা নিয়ে তৈরি তারামণ্ডলটিতে

একটি কাঁকড়ার আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তবে আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে কিছুই চোখে পড়ে না।

তারামণ্ডলটিতে একটি সুন্দর তারাপুঞ্জ আছে, নাম Praesepe বা মৌচাক তারাপুঞ্জ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে শুধু চোখেই হয়ত এটিকে দেখতে পাবে। শুধু চোখে দেখে মনে হয় আবছা আলোর ছোপ, কিন্তু ছোট দূরবীনে আলাদা আলাদা তারাগুলিকে দেখা যায়। চোখে পড়ে প্রায় গোটা চল্লিশেক তারা। পৃথিবী থেকে মৌচাক পুঞ্জটির দূরত্ব 500 আলোকবর্ষ।

কর্কট রাশির δ-তারাটি চান্দ্র নক্ষত্র পুষ্যা। অনেকে অবশ্য মৌচাকপুঞ্জকেই পুষ্যা বলে মনে করেন। মৌচাকপুঞ্জ মধ্যগমন করে মার্চের মাঝামাঝি রাত 9টায় এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভোর 3টে নাগাদ।

কর্কট রাশির পরের রাশি সিংহ। একে দেখতে পাবে কর্কট রাশির ঠিক পূবে। সিংহ রাশির যে তারাটি চট করে চোখে পড়ে তার নাম মঘা, বিদেশী নাম রেগুলাস্ (Regulus)। এর প্রভা 1·36, মানে তারাটি বেশ উজ্জ্বল। মঘার বৈশিষ্ট্য এটি রয়েছে ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক ওপরে। পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব 84 আলোকবর্ষ। মঘাকে ভালভাবে চিনে নিলে কর্কট রাশিকে সহজেই খুঁজে পাবে কারণ কর্কট রাশি রয়েছে মঘা ও পুনর্বসু তারাগুলির ঠিক মাঝামাঝি।

মঘা মধ্যগমন করে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রাত 9টা নাগাদ এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভোর চারটে নাগাদ।

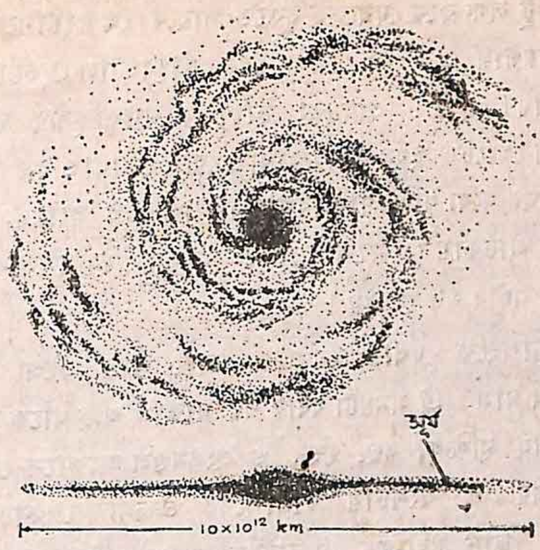
মঘার দক্ষিণে, একটু পশ্চিমের দিকে, দ্বিতীয় প্রভার একটি তারা দেখতে পাবে। তারাটির নাম অ্যালফার্ড (Alphard)। এটি রয়েছে হ্রদসর্প বা হাইড্রা (Hydra) তারামণ্ডলে। হ্রদসর্প তারামণ্ডলটি বিস্তীর্ণ। কর্কটরাশির ঠিক দক্ষিণ থেকে তুলারাশি পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কিন্তু অ্যালফার্ড ছাড়া এতে আর দেখবার কিছু নেই। তারামতলের ζ-তারাটি চান্দ্র নক্ষত্র অশ্লেষা।

ছায়াপথ

রাতের আকাশে তারামণ্ডলগুলিকে চিনে নেবার সময় কখনও কখনও আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া ফিতের মত আবছা আলোর ছোপ হয়ত তোমাদের চোখে পড়েছে। ওটাই হলো ছায়াপথ। শুধু চোখে আবছা আলোর ছোপের মত দেখালেও আসলে কিন্তু ওটা কোটি কোটি তারার সমষ্টি যা ছোট দূরবিন বা বাইনোকুলারে পরিষ্কার দেখা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায়, ছায়াপথ বা **Milky Way** এক বিশাল কুণ্ডলী গ্যালাক্‌সী (**Spiral galaxy**) যার মধ্যেই রয়েছে এই পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য সমেত আমাদের সৌরমণ্ডল। আতস কাঁচের মত মাঝখানটা ফোলা পাতলা চাকতির আকারের ঐ কুণ্ডলীর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। সে তুলনায় প্লুটো সমেত আমাদের সৌরমণ্ডলের ব্যাস মাত্র 1200 কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পুরো সৌরমণ্ডলের ব্যাস ছায়াপথের ব্যাসের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। যদি কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামকে আমাদের ছায়াপথ ধরে নেওয়া যায় তাহলে তাতে সৌরমণ্ডলের আয়তন হবে একটা ভাইরাসের চেয়েও ছোট, অর্থাৎ তাকে শুধু চোখে দেখা যাবে না। ঐ বিশাল ছায়াপথের মধ্যে সৌরমণ্ডল রয়েছে একপাশে, কেন্দ্র থেকে প্রায় 50 হাজার আলোকবর্ষ দূরে। কোটি কোটি তারার সমষ্টি ঐ কুণ্ডলীটি কিন্তু স্থির নেই। সেটা ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, তবে খুবই ধীরগতিতে প্রায় কুড়ি কোটি বছরে এক বার।

এখন হয়ত তোমরা জানতে চাইবে, তাহলে আকাশে ছায়াপথকে লম্বা আলোর ফিতের মত দেখায় কেন ? এর উত্তর খুবই সোজা। যেহেতু ছায়াপথের আকার চ্যাপ্টা চাকতির মত, ছায়া-



ছবি –21 ছায়াপথ গ্যালাক্সি

পথের তল বরাবর দৃষ্টি পথে অসংখ্য তারার সমষ্টি চোখে পড়বে। কিন্তু তলের লম্ব বরাবর দৃষ্টিপথে তা হবে না কারণ সে দিকে তারার সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং ছায়াপথের ভেতরে যে কোনও বিন্দু থেকে পুরো গ্যালাক্সীটাকে একটা তারার মেখলার মত দেখাবে। পৃথিবী থেকেও তাই হয়। তবে যেহেতু সৌরমণ্ডল ছায়াপথের একপাশে রয়েছে, সেজন্য পৃথিবী থেকে ছায়াপথের কেন্দ্র যেদিকে সেদিকের অংশটা বেশি ঘন ও উজ্জ্বল দেখায়। যে সব তারামণ্ডলগুলিকে পৃথিবীর আকাশে দেখা যায় তারা সকলেই ছায়াপথের মধ্যেই রয়েছে।

রাতের আকাশে ছায়াপথকে দেখতে পাবে উত্তরে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে। সেখান থেকে দক্ষিণ পূবে পারসিউস্, প্রজাপতি, মিথুন ও কালপুরুষকে পেরিয়ে সে চলে গেছে দক্ষিণ ক্রুশের মধ্য দিয়ে। তারপর আবার উত্তরমুখী হয়ে সেণ্টরাস্, বৃশ্চিক, ধনু, সর্পমণ্ডল, শ্বেনমণ্ডল ও হংসমণ্ডল পার করে ফিরে এসেছে ক্যাসিও-পিয়াতে। প্রথম প্রভার একুশটি তারার মধ্যে ষোলটিকে দেখতে পাবে ছায়াপথের মধ্যে বা তার আশেপাশে।

একটু লক্ষ করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্য সব জায়গায় এক নয়, কেমন যেন জোড়াতালি দেওয়া মনে হয়। এর কারণ দু'টি। প্রথমতঃ ছায়াপথ গ্যালাক্সীর মধ্যে তারার সমাবেশ মোটেই সুষম নয়, কোথাও বেশি কোথাও কম। দ্বিতীয়তঃ ছায়াপথের মধ্যে ধূলিকণার বিশাল বিশাল মেঘ রয়েছে যা তারার আলো আটকায়। ফলে রাতের আকাশে ছায়াপথকে অনেকটা চর পড়া নদীর মত দেখায়।

ছায়াপথকে দেখার সব চেয়ে ভাল সময় হলো আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস। ঐ সময়টা বর্ষার পর আকাশ স্বচ্ছ থাকে। তাছাড়া ঐ সময়েই বৃশ্চিক, ধনু, শ্যেন ও হংসমণ্ডল আকাশে দেখা যায়। আকাশের ঐ অংশটায় ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া ছোট দূরবিনে বা বাইনোকুলারে বৃশ্চিক আর ধনুরাশির মধ্যেকার এলাকায় বেশ কয়েকটি সুন্দর বর্তুলাকার তারকাগুচ্ছ (globular cluster) দেখতে পাবে।

তবে একটা কথা মনে রেখ, শহরের ধুলো ধোঁয়া আর বিজলী বাতির চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যে দিয়ে ছায়াপথকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ছায়াপথের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে হলে চলে যেতে হবে শহর থেকে দূরে, যেখানে এসব নেই।

রাতের আকাশে গ্রহ

ছায়াপথ ছাড়া আকাশে তারামণ্ডলগুলির মাঝে কখনও কখনও কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখতে পাওয়া যায় যাদের শুধু চোখে অবিকল তারার মত দেখায়। কিন্তু কিছুদিন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সেগুলি তারার মত স্থির নয়। বরং ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। ঐ চলমান জ্যোতিষ্কগুলিই গ্রহ।

তোমরা হয়ত জানো যে গ্রহরা আমাদের সৌর পরিবারেই সদস্য। শুধু চোখে তারাদের মত দেখালেও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব খুবই কম। আর সেজন্যই আকাশে তাদের চলন অত সহজে চোখে পড়ে।

সৌরমণ্ডলের কেবল পাঁচটি গ্রহ পৃথিবী থেকে শুধু চোখে দেখা যায়। সেগুলি যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। ইউরেনাসকে ছোট দূরবীনেও দেখা যায়, কিন্তু নেপচুন ও প্লুটোকে দেখার জন্য চাই খুব শক্তিশালী দূরবীন।

আকাশে তারামণ্ডলগুলির মাঝে গ্রহদের চেনা কঠিন মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। এর প্রধান কারণ গ্রহগুলি (প্লুটো বাদে) কখনোই ক্রান্তিবৃত্তের দুপাশে 9 ডিগ্রীর বেশী দূরে যায় না। তাছাড়া বেশীর ভাগ সময়েই তাদের দেখতে পাওয়া যায় রাশিচক্রের কোনও না কোনও তারামণ্ডলের মধ্যে। সুতরাং যদি রাশিচক্রের তারামণ্ডলগুলিকে ভালভাবে চিনে নিতে পারো তাহলে তাদের মাঝে মঙ্গল, বৃহস্পতি বা শনিকে সহজেই খুঁজে নিতে পারবে।

আগেই বলেছি, আপাত দৃষ্টিতে তারা ও গ্রহদের মধ্যে প্রধান তফাৎ আকাশে তাদের অবস্থানের ক্রম পরিবর্তন। তারামণ্ডলগুলিকে যদিও প্রতিদিন প্রায় এক ডিগ্রী করে পশ্চিমে সরতে দেখা

যায়, তাতে তারাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু গ্রহদের বেলায় তা নয়। যেমন ধরো, শুক্র সূর্যের খুঁব কাছে থাকার দরুণ আকাশে তার গতি খুব দ্রুত। কখনও কখনও তাকে দিনে 2 ডিগ্রী পর্যন্ত সরে যেতে দেখা যায়। অপরদিকে, সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুণ শনির গতি খুবই মন্থর—এক মাসে মাত্র 1 ডিগ্রী বা তারও কম।

শুধু তাই নয়। সূর্যের কক্ষপথে পৃথিবী এবং বাকি গ্রহগুলির পারস্পরিক অবস্থানের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে একটা মজার ব্যাপার হয়। সাধারণত, আকাশে তারাদের মাঝে গ্রহগুলিকে পশ্চিম থেকে পূবে চলতে দেখা যায়। কিন্তু কখনও কখনও কোনও একটি গ্রহের ঐ চলন প্রথমে থেমে যায়। তারপর গ্রহটিকে উল্টো-দিকে, অর্থাৎ পূব থেকে পশ্চিমে চলতে দেখা যায়। কিছুদিন পরে ঐ বিপরীত চলনও থেমে যায় এবং গ্রহটিকে আবার পশ্চিম থেকে পূবে চলতে দেখা যায়। মঙ্গলের বেলায় এ ব্যাপারটা সহজেই চোখে পড়ে। তবে একটা কথা মনে রেখ, আকাশে গ্রহদের পশ্চিম থেকে পূবে বা পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাওয়াটা কেবল মাত্র পর পর কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে লক্ষ্য করার পরই চোখে পড়ে। যে কোনও একদিনে তারাদের মতই যে কোনও গ্রহকে আকাশে পূবে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায়।

আরও একটা ব্যাপার আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে রয়েছে। এর ফলে এ দুটি গ্রহ দু'বার এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। ঐ সময় পৃথিবী, সূর্য ও গ্রহের অবস্থান প্রায় একই সরল রেখার হওয়ার দরুণই অমন হয়। ঐ দুটি অবস্থাকে সংযোগ (conjunction) বলা হয়। যখন বুধ বা শুক্র সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, অর্থাৎ অবস্থাটা হয় পৃথিবী-গ্রহ-সূর্য, তখন তাকে বলা হয় অন্তসংযোগ (inferior conjunction)। যদি গ্রহটি সূর্যের অপরদিকে থাকে, অর্থাৎ অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায়

পৃথিবী-সূর্য-গ্রহ, তখন তাকে বলা হয় বহিঃসংযোগ (superior conjunction)।

বুঝতেই পারছো, অন্তসংযোগের সময় গ্রহটি পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে এসে পড়ে (যদিও তাকে তখন দেখা যায় না), আর বহিঃ-সংযোগের সময় পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয় সব চেয়ে বেশী। তবে এটা কেবলমাত্র বুধ ও শুক্রের বেলাতেই হয়। বাকি গ্রহগুলির বেলায় ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় অন্য রকম, কারণ সেক্ষেত্রে পৃথিবী-গ্রহ-সূর্য অবস্থাটা হওয়া অসম্ভব। অবশ্য এখানেও দুটি অনুরূপ পরিস্থিতি আসে। যেমন, গ্রহ-পৃথিবী-সূর্য এবং পৃথিবী-সূর্য-গ্রহ। প্রথমটিকে বলা হয় প্রতিযোগ (opposition) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সংযোগ। এক্ষেত্রে প্রতিযোগের সময় পৃথিবী থেকে গ্রহের দূরত্ব হয় সবচেয়ে কম, সংযোগের সময় সবচেয়ে বেশী। আরও একটা ব্যাপার হলো এই যে প্রতিযোগের সময় গ্রহটিকে সারা রাত ধরে আকাশে দেখা যায় যা অন্য কোনও সময় হয় না।

এতো গেল গ্রহদের বৈশিষ্টের কথা। এবারে দেখা যাক বিভিন্ন গ্রহকে চেনা যায় কি করে।

শুধু চোখে যে পাঁচটি গ্রহকে দেখা যায় বুধ তাদের মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। সে জন্য বুধকে দেখা খুবই দুষ্কর কারণ প্রায় সর্বক্ষণই সে সূর্যের তীব্র আলোয় ঢাকা থাকে। যেহেতু বুধের কক্ষ-পথ খুবই ছোট, সে কখনই সূর্য থেকে 28 ডিগ্রীর বেশী দূরে যায় না। সুতরাং তাকে দেখার উপযুক্ত সময় হলো সূর্যাস্তের ঠিক পরে কিংবা সূর্যোদয়ের ঠিক আগে। তবে সেসময়েও বুধ থাকে আকাশের খুবই নীচে যেখানে দিগন্তের ধুলো ধোঁয়া, ভেদ করে তাকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে একটা সময় আছে যে সময় কয়েক মিনিটের জন্য বুধকে আকাশে পরিষ্কার দেখা যায়। সেটা হলো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় যেমনটি হয়েছিল 1980 সালের 16 ফেব্রুয়ারি তারিখে। অবশ্য সে সময় বুধ যদি কোনও সংযোগ অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে দেখা যাবে না।

বুধের পরের গ্রহ শুক্র। তোমরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে জ্বলজ্বলে 'সন্ধ্যাতারা' বা ভোরের আকাশে 'শুকতারা'কে নিশ্চয়ই দেখেছ। ওটাই শুক্রগ্রহ। শুক্রের বৈশিষ্ট্য তার অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য যা তাকে সহজেই চিনিয়ে দেয়।

আগেই বলেছি, শুক্র দুবার সংযোগ অবস্থায় আসে। গড়ে দুই সংযোগের মধ্যে ব্যবধান থাকে প্রায় 290 দিনের। তার মধ্যে প্রায় 210 দিন, অর্থাৎ সাত মাস ধরে শুক্রকে দেখা যায়—বহিঃসংযোগের পর পশ্চিম আকাশে কিংবা অন্তসংযোগের পরে পূব আকাশে—তবে সমান সময়ের ব্যবধানে নয়।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। ধরো, বহিঃসংযোগের পর শুক্রকে সবে দেখা গেছে সন্ধে বেলায় পশ্চিম আকাশে, তাহলে আরও প্রায় সাত মাস ধরে তাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে। প্রথমে তাকে ক্রমশঃ পূবে সরতে দেখা যাবে। প্রায় সাড়ে চার মাস পরে (সূর্য থেকে যখন প্রায় 48 ডিগ্রী দূরে) আবার তাকে পশ্চিম মুখে চলতে দেখা যাবে এবং প্রায় দেড় দু'মাসের মধ্যেই সে আবার সূর্যেও আলোয় চাপা পড়ে যাবে। এর পর প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই, অন্তসংযোগের পর শুক্রকে দেখা যাবে সূর্যোদয়ের আগে পূব আকাশে। এবারে সে প্রথমে পশ্চিম মুখে চলবে, তারপর বহিঃসংযোগের ঠিক আগে পূব দিকে চলে আবার সূর্যের আলোয় মিলিয়ে যাবে। অন্তসংযোগ ও বহিঃসংযোগের মধ্যে শুক্রকে পূব আকাশে দেখা যাবে প্রায় সাত মাস ধরে। কিন্তু বহিঃসংযোগের পর পশ্চিম আকাশে ফিরে আসতে তার সময় লাগবে প্রায় সাড়ে চার মাস। তারপর এই চক্র চলতে থাকবে।

শুক্রের ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী হয় যখন সে আকাশে সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, অর্থাৎ দুই সংযোগের মাঝামাঝি সময়ে। ঐ সময় তার প্রভা হয়ে দাঁড়ায়—4·4। যখন তার ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে কম তখন তার প্রভা হয়—3·3। বুঝতেই পারছো, রাতের আকাশে চাঁদ ছাড়া শুক্রই হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আকাশে মঙ্গল গ্রহকে চেনা খুবই সহজ কারণ এর গাঢ় কমলা রংই একে চিনিয়ে দেয়। রাশিচক্রের চেনা তারাদের মধ্যে যদি অচেনা কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখতে পাও যার রং গাঢ় কমলা তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারো সেটাই মঙ্গল। অবশ্য মঙ্গল যদি বৃশ্চিক রাশিতে থাকে তাহলে হয়ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সঙ্গে তাকে অনেকে গুলিয়ে ফেলতে পারে। তবে তারামণ্ডলটিকে যদি ভাল করে চেনা থাকে তাহলে সে ভুল হবে না।

প্রতিযোগের সময় মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। তখন তার প্রভা হয়ে দাঁড়ায়—2·8। পৃথিবী থেকে যখন সবচেয়ে দূরে (সংযোগের সময়) তখন ঐ প্রভা হয়ে যায় +2·0। ঐ সময় মঙ্গলকে চেনা বেশ কঠিন ব্যাপার। মনে রেখ, মঙ্গলের বেলায় প্রতিযোগ ঘটে প্রতি 26 মাস অন্তর।

বুধ ও মঙ্গলের পর আকাশের তৃতীয় উজ্জ্বল গ্রহ বৃহস্পতি। প্রতি 13 মাস অন্তর প্রতিযোগের সময় বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন হলদে রং এর ঐ জ্যোতিষ্কটির প্রভা হয়ে দাঁড়ায় -2·3। সে সময় তাকে চিনে নেওয়া খুবই সোজা। সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুন আকাশে বৃহস্পতির গতি খুবই মন্থর। রাশিচক্রের একটি তারামণ্ডল অতিক্রম করতে তার সময় লাগে পুরো এক বছর। সুতরাং একবার যদি তাকে চিনে নিতে পারো তাহলে বছরের পর বছর তার ওপর নজর রাখতে পারবে। যেমন ধরো, 1986 সালে বৃহস্পতিকে দেখা গেছে কুম্ভ রাশিতে। আগামী বছর তাকে দেখা যাবে মীন রাশিতে, তার পরের বছর মেষ রাশিতে, এই ভাবে চলতে থাকবে। আরও একটা সুবিধে এই যে, বছরে প্রায় 11 মাস ধরে বৃহস্পতিকে আকাশে দেখা যায়, যদিও সে সময়ের মধ্যে তার ঔজ্জ্বল্যে যথেষ্ট কম বেশী হয়। প্রতিযোগের সময় যদি ছোট দূরবীন বা বাইনোকুলারে বৃহস্পতিকে দেখ তবে তার চারটি চাঁদকে পরিষ্কার দেখতে পাবে, তাদের দেখাবে জ্বলজ্বলে বৃহস্পতির দুপাশে সারি বাঁধা ছোট ছোট আলোর বিন্দুর মত।

শুধু চোখে যে কটি গ্রহকে দেখা যায় শনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ। হাল্কা হলদে রং এর গ্রহটি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। প্রতিযোগের সময় এর প্রভা হয় —0.04। অন্য সময় অনেক কম, প্রায় দ্বিতীয় প্রভার তারা বলেই মনে হয়।

দূরত্ব ছাড়াও শনির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যের আর এক কারণ তার বলয়। শনি তার অক্ষে প্রায় 27 ডিগ্রী হেলে আছে বলে তার বলয়টা পৃথিবী থেকে পুরো নজরে আসে না—কখনও বেশ কিছুটা দেখা যায় আবার কখনও একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। যখন বলয়টি পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে তখন শনিকে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল দেখায়। সাত বছর পরে যখন বলয়টি ধার বরাবর অবস্থায় আসে তখন তাকে প্রায় দেখাই যায় না। সে সময় শনির উজ্জ্বল্যও বেশ কমে যায়। আরও সাত বছর পরে যখন বলয়টি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে, শনি তার হারানো ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়।

বৃহস্পতির মত শনিরও প্রায় 13 মাস অন্তর প্রতিযোগ ঘটে যে সময় সারা রাত ধরে তাকে আকাশে দেখা যায়। তবে বৃহস্পতির চেয়ে দূরে আছে বলে আকাশে তার গতি আরও মন্থর। রাশি-চক্রের একটি তারামণ্ডল অতিক্রম করতে শনির সময় লাগে প্রায় আড়াই বছর।

একটা কথা মনে রেখ, ছবিতে শনির বলয়ের যে চেহারা তোমরা দেখেছ সেটা কেবলমাত্র খুব শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। ছোট দূরবীন বা বাইনোকুলারে প্রতিযোগের সময় হয়ত বলয়ের কিছুটা আভাষ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তার বেশী নয়। তবে একটা কথা বলে রাখি, 1987 সালের জুন-জুলাই মাসে প্রতিযোগের সময় শনির বলয়কে পৃথিবী থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে। সে সময় যদি কোনও বড় দূরবীনে শনিকে দেখার সুযোগ পাও তবে তার মনোরম সৌন্দর্য নিশ্চয়ই তোমাদের মুগ্ধ করবে।

একই তারামণ্ডল বছরের কোন্ মাসে কোন্ সময় দেখা যাবে*

1 জানুয়ারী	রাত	9টা	15 জানুয়ারী	রাত	8টা
1 ফেব্রুয়ারী	সন্ধ্যে	7টা	15 ফেব্রুয়ারী	সন্ধ্যে	6টা
1 মার্চ	বিকেল	5টা	15 মার্চ	বিকেল	4টা
1 এপ্রিল	বিকেল	3টে	15 এপ্রিল	দুপুর	2টো
1 মে	দুপুর	1টা	15 মে	দুপুর	12টা
1 জুন	সকাল	11টা	15 জুন	সকাল	10টা
1 জুলাই	সকাল	9টা	15 জুলাই	সকাল	8টা
1 আগস্ট	সকাল	7টা	15 আগস্ট	ভোর	6টা
1 সেপ্টেম্বর	ভোর	5টা	15 সেপ্টেম্বর	ভোর	টে
1 অক্টোবর	ভোর	3টে	15 অক্টোবর	রাত	2টো
1 নভেম্বর	রাত	1টা	15 নভেম্বর	রাত	12টা
1 ডিসেম্বর	রাত	11টা	15 ডিসেম্বর	রাত	10টা

* তালিকায় দিনের সময়ও দেখানো হয়েছে, যদিও সেসময় তারামণ্ডল দেখা সম্ভব নয়।

প্রথম প্রভার তারা

	নাম	রং	প্রভা	তারামণ্ডল	মধ্যগমন করে*
1.	লুব্ধক	নীলচে সাদা	—1·45	বৃহৎ কুকুরমণ্ডল	1 ফেব্রুয়ারি
2.	অগস্ত্য	হালকা হলদে	—0·73	কেরিনা	26 জানুয়ারি
3.	আলফা সেণ্টরি	হলদে	—0·10	সেণ্টরাস্	1 জুন
4.	স্বাতী	কমলা	—0·06	বুওটিস্	20 মে
5.	অভিজিৎ	নীলচে সাদা	+ 0.04	বীণা	25 জুলাই
6.	ব্রহ্মহৃদয়	হলদে	0·08	প্রজাপতি	5 জানুয়ারি
7.	বাণরাজা	নীলচে সাদা	0·11	কালপুরুষ	5 জানুয়ারি
8.	প্রশ্বন	হালকা হলদে	0·35	ছোট কুকুরমণ্ডল	12 ফেব্রুয়ারি
9.	আখের্নার	নীলচে সাদা	0·48	এরিডানাস	12 নভেম্বর
10.	বিটা সেণ্টরি	নীলচে সাদা	0·60	সেণ্টরাস্	18 মে
11.	শ্রবণা	নীলচে সাদা	0·77	শ্যেনমণ্ডল	15 আগস্ট
12.	আর্দ্রা	লাল	0·80	কালপুরুষ	15 জানুয়ারি
13.	রোহিনী	লাল	0·85	বৃষ	26 ডিসেম্বর
14.	আলফাক্রুসিস্	সাদা	0·96	দক্ষিণ ক্রস্	25 এপ্রিল
15.	চিত্রা	সাদা	0·96	কন্যা	7 মে
16.	জ্যেষ্ঠা	লাল	1·00	বৃশ্চিক	25 জুন
17.	প্রথম পুনর্বসু	হলদে	1·15	মিথুন	10 ফেব্রুয়ারি
18.	ফোমালো	সাদা	1·16	দক্ষিণ মীন	1 অক্টোবর
19.	দেনেব	সাদা	1·25	হংস মণ্ডল	30 আগস্ট
20.	বিটা ক্রুসিস্	নীলচে সাদা	1·26	দক্ষিণ ক্রস্	30 এপ্রিল
21.	মঘা	সাদা	1·4	সিংহ	15 মার্চ

* স্থানীয় সময় রাত 10টায়

কয়েকটি তারার ব্যাস*

নাম	ব্যাস (কিলোমিটার)
1. আর্দ্রা	10, 500 লক্ষ
2. জ্যেষ্ঠা	7, 140 "
3. অগস্ত্য	1, 150 "
4. রোহিণী	476 "
5. স্বাতী	322 "
6. অভিজিৎ	77 "
7. মঘা	66 "
8. প্রশ্বন	57 "
9. লুব্ধক	48 "
10. শ্রবণা	47 "
11. ফোমালো	46 "
12. চিত্রা	22 "

* সূর্যের ব্যাস = 14 লক্ষ কিলোমিটার